রুদ্রাণী

রুদ্রাণী

: প্রাপ্তিস্থান :

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম কামিনী সংস্করণ ঃ
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া— ১৩৬৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর ঃ
গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী
অবলা প্রেস
১/এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

যশস্বী চিকিৎসক
ডাঃ তরুণ লাহিড়ী মজুমদার

এক

সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি মিত্তিরদের পুকুর থেকে চান করে ফিরতেই দেখি, বাবা খেয়েদেয়ে বারান্দায় তক্তাপোষে তাকিয়া হেলান দিয়ে তামাক খাচ্ছেন। ওদিকে রান্নাঘর থেকে মা একটু গলা চড়িয়েই বললেন, ওরে মানিক, তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে খেতে আয়। এর পর কখন খাবি আর কখন স্কুলে যাবি।

আমি ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চিৎকার করি, আসছি মা !

আমি জামা-প্যান্ট পরে রান্নাঘরে ঢুকতেই মা বললেন, নিবারণ না থাকলেই তোর বাঁদরামি বড্ড বেড়ে যায়। চান করতে গেলে আর বাড়িতে ফেরার কথা মনেই পড়ে না।

আমি কোনও উত্তর না দিয়ে খেতে বসি।

আমি চুপ করে থাকলেও মা বলে যান, নিবারণ এলে তোর পুকুরে চান করা ঘুচিয়ে দেবে।

এবার আমি মুহূর্তের জন্য মুখ তুলে মা'র দিকে তাকিয়ে বলি, নিবারণ-কাকাই তো আমাকে সাঁতার শিখিয়েছে। পুকুরে না গেলে সাঁতার কাটবো কোথায়?

নিবারণ সাঁতার শিখিয়েছে বলে কী ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুকুরে কাটাতে হবে?

ব্যস! ঠিক সেই সময় নিবারণ কাকা এসে হাজির।

আমি এক গাল খুশির হাসি হেসে বললাম, নিবারণকাকা, তুমি নেই বলে মা'র বকুনি খেতে খেতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

ওকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই মা জিজ্ঞেস করলেন, কী হল নিবারণ? ছেলে না মেয়ে?

নিবারণকাকা রান্নাঘরের মেঝেয় বসে মুখ নীচু করে একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলল, বৌঠান, মেয়ে হয়েছে।

খুব ভাল খবর।

মা প্রায় না থেমেই জিজ্ঞেস করলেন, মেয়ে বউ দু'জনেই ভাল আছে তো?

হ্যাঁ, ভালই আছে।

নিবারণকাকা একটু উত্তেজিত হয়ে চাপা খুশির হাসি হেসে বলল, জানেন বৌঠান, মা বলছিল, মেয়েটা নাকি খুব সুন্দর দেখতে হবে।

তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর গায়ের রঙ একটু চাপা হলেও দু'জনেরই তো চোখ মুখ বেশ ভাল। মেয়ে যে দেখতে ভাল হবে, সে ব্যাপারে সন্দেহের কী আছে।

নিবারণকাকা বলল, যাইহোক বৌঠান, মেয়েটা যেন বেঁচে থাকে, এই আশীর্বাদ করবেন।

তুমি তো কারুর ক্ষতি করো না নিবারণ। তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই সুখীও হবে, দীর্ঘজীবিও হবে।

নিবারণকাকা এক গাল হাসি হেসে বলল, আপনার মত সতী-সাবিত্রী যখন বলেছেন, তখন আমার মেয়ে যে সুখেও থাকবে আর দীর্ঘজীবীও হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বহুদিন আগেকার ঘটনা হলেও আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের এইসব কথা। তখন আমি কোন ক্লাসে পড়ি? বোধহয় এইট বা নাইন'এ। মনে হয়, তখন আমার বয়স ছিল চোদ্দ কি পনের।

আমি জন্মাবার পর থেকেই নিবারণকাকাকে আমাদের বাড়িতে দেখেছি। খুব ছোটবেলায় মা আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে দেবার পর আমি নিবারণকাকার কোলে চড়েই বুড়ো শিবের মন্দিরের সামনের মাঠে বেড়াতে যেতাম। একটু-আধটু খেলাধূলাও করতাম সমবয়সী দু'পাঁচজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে।

একটু বড় হবার পর নিবারণকাকার সঙ্গে আরো কত কি দেখেছি, কত জায়গায় বেড়িয়েছি। আমার বেশ মনে আছে, আমি ওর কাঁধে চড়ে রথ দেখতে যেতাম। ওর সঙ্গেই আমি প্রথম গঙ্গায় চান করেছি, নৌকায় চড়েছি, সার্কাস দেখেছি। আরো কত কি!

আচ্ছা নিবারণকাকা, সার্কাসের ঐ মেয়েটা দড়ির উপর দিয়ে হাঁটলো কী করে?

অনেক দিন ধরে শিখলে অনেক কিছুই পারা যায়।

আমিও পারবো?

চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে।

আমি একটু ভেবে প্রশ্ন করি, নিবারণকাকা আমি তো দড়ির উপরে উঠতেই পারবো না।

এবার নিবারণকাকা আমাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে করতে বলে,

সবকিছু শেখার জন্যই গুরু চাই, মাষ্টার চাই। ওরা দেখিয়ে শুনিয়ে না দিলে তো কিছুই শেখা যায় না বাবা।

বাবা শুধু স্কুলের সময়টুকু ছাড়া সকাল-বিকেল-সন্ধেয় ছাত্রদের পড়াতেই ব্যস্ত থাকতেন। আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবাব সময় তাঁর ছিল না। তাইতো আমি সব সময় নিবারণকাকার সঙ্গেই সব জায়গায় যেতাম আর কত কি দেখতাম। কিন্তু দেখেই আমি চুপ করে থাকতে পারতাম না।

আচ্ছা নিবারণকাকা, ঐ যে রথের উপর জগন্নাথদেব বসেছিলেন, তাঁর হাত-পা নেই কেন?

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, লক্ষ্মী-সরস্বতী, মা দুর্গা, মা কালী বা কার্তিক-গণেশ-শিব সবারই তো হাত-পা আছে। শুধু জগন্নাথদেবের হাত-পা নেই কেন?

নিবারণকাকা এক গাল হাসি হেসে আমাব মাথা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, সত্যি শুনতে চাও?

হ্যাঁ, শুনতে চাই।

কিন্তু তুমি কী মনে রাখতে পারবে?

তুমি আস্তে আস্তে বললে ঠিক মনে রাখতে পারবো।

হ্যাঁ. নিবারণকাকা আস্তে আস্তেই বলে, এক ব্যাধের তীর লেগে শ্রীকৃষ্ণ মারা যান। তারপর শ্রীকৃষ্ণের কয়েকজন ভক্ত তাঁব অস্থি একটা বাক্সের মধ্যে . . .

অস্থি কী নিবারণকাকা?

অস্থি মানে হাড়।

ও!

ওদিকে ইন্দ্রদুম্ন নামে এক রাজা খুব বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি দিনরাত ভাবছিলেন, কি ধরনের মূর্তিতে বিষ্ণুকে পূজা করবেন। তখন বিষ্ণু এসে রাজা ইন্দ্রদুম্নকে বললেন, আমার নতুন ধরনের মূর্তি তৈরি করো কিন্তু তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্থি থাকবে। . . .

তারপর?

তারপর স্বয়ং বিশ্বকর্মাকে এই মূর্তি তৈরি করার ভার দিলেন। বিশ্বকর্মা রাজিও হলেন কিন্তু এক শর্তে।

কী সেই শর্ত?

বিশ্বকর্মা বললেন, আমি আস্তে আস্তে মূর্তি তৈরি করবো কিন্তু মূর্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না।

তারপর?

বিশ্বকর্মা মূর্তি তৈরি করে চলেছেন কিন্তু শেষ হচ্ছে না দেখে ইন্দ্রদুম্ন অধৈর্য

হয়ে হঠাৎ সেই মূর্তি তৈরি করার জায়গায় হাজির হলেন। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্মা রাগ করে চলে গেলেন।

তখন মূর্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল?

না, না, হয়নি; তখনও অর্ধেক কাজ বাকি।

তাহলে কী হল?

শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা এসে ঐ মূর্তির চোখ আর প্রাণ দান করে চলে গেলেন।

নিবারণকাকা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, বুঝলে তো কেন জগন্নাথদেবের মূর্তি ঐ রকম ?

হ্যাঁ।

মনে থাকবে?

আমি একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বলি, হ্যাঁ, থাকবে।

নিবারণকাকা যে সত্যি সত্যিই আমার পরীক্ষা নেবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।

তিন-চারদিন পরের কথা। আমি পড়াশুনা শেষ করে খাবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকতেই দেখি, মা আর নিবারণকাকা কথা বলছেন। আমাকে দেখেই নিবারণকাকা জিজ্ঞেস করল, কী মানিক, কালকের স্কুলের সব পড়াশুনা-লেখালেখি হয়ে গেল?

হ্যাঁ।

আমি একটু থেমে বলি, তাইতো খেতে আসতে দেরি হল।

কাল মাষ্টার মশাইরা পড়াশুনা ধরলে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবে তো?

পারব না কেন?

নিবারণকাকা একটু হেসে বলে, ঠিক আছে; তুমি আমার কাছেই একটা পরীক্ষা দাও।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, তুমি আবার কী পরীক্ষা নেবে? তুমি কি আমার স্কুলের বই-টই পড়েছ?

স্কুলের বই না পড়লে কী পরীক্ষা নেওযা যায় না?

ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করে, বল তো জগন্নাথদেবের মূর্তি ঐরকম কেন?

আমি গড় গড় করে পুরো কাহিনীটা বলতেই নিবারণকাকা চিৎকার করে উঠল, শুনলেন বৌঠান, শুনলেন?

ও ডান হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, একবার শুনে পুরো কাহিনীটা মনে রাখা আর কোনও ছেলের কম্মো না।

মা একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, না, না, এমন ছেলে আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নেই।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলতে পারব না বৌঠান, তবে এ চত্বরে আমাদের মানিকের মত বুদ্ধিমান ছেলে নেই।

আমি একটু হেসে বলি, ঠিক বলেছ নিবারণকাকা।

মা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বকুনি দেন, চুপ কর বাঁদর ছেলে!

শুধু চণ্ডীতলা বা বিষ্ণুপুর না, গঙ্গার এপার-ওপারের অন্তত বিশ-পঁচিশটা গ্রামের মানুষ ঠাকুরদাস মুখুজ্যেকে সাক্ষাৎ দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো তাঁর পাণ্ডিত্য আর বিচার-বুদ্ধির জন্য। ত্রিপুরা, কোচবিহার, দীঘাপতি, কাশিমবাজার থেকে ময়ূরভঞ্জের রাজারা পর্যন্ত মাঝে-মধ্যেই ওকে আমন্ত্রণ করে কালিদাস-ভবভূতির কাব্যের ব্যাখ্যা ও আলোচনা শুনতেন। বর্ধমানের মহারাজ তো ওঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন।

ঠাকুরদাসের বয়স যখন মাত্র তিরিশ, তখনই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। তখন ওঁর একমাত্র পুত্র গুরুদাস মাত্র পাঁচ বছরের শিশু। তখন ঠাকুরদাসের দূর সম্পর্কীয়া এক নিঃসন্তান বিধবা বোন এসে এই শিশুপুত্রের লালন-পালনের দায়িত্ব নিলেন।

গুরুদাসও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বটতলার পাঠশালার অঘোর পণ্ডিত ওকে যত দেখেন, ততই অবাক হয়ে যান। ওকে বছর দুয়েক পড়াবার পরই অঘোর পণ্ডিত একদিন ঠাকুরদাসের কাছে হাজির।

আরে অঘোর, এসো, এসো।

তালপাতার আসনখানা এগিয়ে দিয়ে ঠাকুরদাস হাসতে হাসতে বলেন, বুঝলে অঘোর, তুমি এখন না এলে আজ বিকেলেই বোধহয় আমি তোমার কাছে যেতাম।

কেন?

রাজা-মহারাজের খেয়াল-খুশির কথা আর কি বলব!

ঠাকুরদাস একুট চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলে যান, প্রায় বছর খানেক আগে একদিন বর্ধমানের রাজাবাহাদুর আমাকে এক সমস্যায় ফেলেছিলেন।...

সমস্যা মানে?

ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' আর 'উত্তররামচরিত' তো রামায়ণ অবলম্বনেই লেখা।

হ্যাঁ, তাইতো।

রাজাবাহাদুরের প্রশ্ন হচ্ছে, ভবভূতি কী এই দু'টি নাটকে কোথাও কোথাও মূল রামায়ণকে উপেক্ষা করে নিজেই একটা নতুন রামায়ণ রচনার চেষ্টা করেন নি?

অঘোর পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বলেন, উপেক্ষা না করলেও মূল রামায়ণের মূল কাহিনী নিশ্চয়ই বার বার অতিক্রম করেছেন।

ঠাকুরদাস বলেন, রাজাবাহাদুরের দ্বিতীয় প্রশ্ন কী জানো?

কী?

'উত্তররামচরিত'-এ ভবভূতি যে দাম্পত্য প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা কী বাল্মীকিকে ম্লান করে দেয়নি?

অঘোর পণ্ডিত একটু হেসে বলেন, রাজাবাহাদুর তো একটা খুব মূল্যবান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন।

বুঝলে অঘোর, রাজাবাহাদুর সত্যিই পণ্ডিত মানুষ। তিনি কী আজেবাজে প্রশ্ন করতে পারেন?

ঠাকুরদাস একটু থেমে বলেন, রাজাবাহাদুরের প্রশ্নের উত্তর আমি লিখে ফেলেছি। তাই ভাবছিলাম, তোমাকে শোনাবার পরই রাজাবাহাদুরের কাছে যাবো।

সে তো অত্যন্ত আনন্দের ও সম্মানের ব্যাপার। যে কোন দিন বিকেলে চলে এসো।

হ্যাঁ, দু'-একদিনের মধ্যেই আসব।

এবার অঘোর পণ্ডিত বললেন, ভাই ঠাকুরদাস, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।

দ্যাখো ভাই, তোমার ছেলে গুরুদাসকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি ও গুরুদাসও আমাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করে।

ঠাকুরদাস একটু হেসে বলেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।

তুমি গুরুদাসকে একটা ভাল ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দাও।

ইংরেজি স্কুলে?

হ্যাঁ, ইংরেজি স্কুলে।

অঘোর পণ্ডিত একটু থেমে বলেন, গুরুদাস অসম্ভব মেধাবী ছেলে। ওকে আমার পাঠশালায় আর পড়ানো ঠিক হবে না।

কী বলছো তুমি?

হ্যাঁ, ভাই, ঠিক কথাই বলছি। তুমি ওকে কেষ্টনগর-শান্তিপুরের কোনও ভাল স্কুলে ভর্তি করে দাও।

ঠাকুরদাস বন্ধুর কথা শুনে অবাক হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারেন না। কি যেন চিন্তা করেন।

অঘোর পণ্ডিত আবার বলে যান, আমার পাঠশালায় এই অঞ্চলের নানা ধরনের ছেলে পড়তে আসে কিন্তু এই কয়লাখনির মধ্যেই দু'-চারটে হীরার সন্ধান পেয়েছি। গুরুদাস তেমনি একটা হীরা।

ঠাকুরদাস একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি তো ভাই আমাকে চিন্তায় ফেললে।

কেন ভাই?

পাঁচজন গুণী-জ্ঞানীর কৃপায় আমার ঠিক অন্নবস্ত্রের অভাব না থাকলেও অর্থাভাব নিত্যকার সঙ্গী। তার উপর আমার পারিবারিক জীবনের কোনও খবরই তোমার অজানা নয়।

উনি একটু থেমে বলেন, তাই আমার পক্ষে বোধহয় এখনই ছেলেকে কোন শহরে রেখে ইংরেজি স্কুলে পড়ানো সম্ভব নয়। তবে যত তাড়াতাড়ি পারি, তোমার পরামর্শমত কাজ করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো।

অঘোর পণ্ডিত একটু হেসে বললেন, তুমি যদি অনুমতি দাও, তাহলে আমি গুরুদাসের ব্যাপারে একটু উদ্যোগী হতে পারি।

আমি আবার কী অনুমতি দেব? গুরুদাসের ব্যাপারে তুমি নিশ্চয়ই উদ্যোগী হতে পারো কিন্তু ভাই, তার আগে আমাকে একটু চেষ্টা করতে দাও।

অঘোর পণ্ডিতের কাছ থেকে শোনার পর কথাটা এর-ওর মুখ থেকে শেষ পর্যন্ত কাশিমবাজার মহারাজার কানে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে উনি লোক পাঠালেন ঠাকুরদাস মুখুজ্যের কাছে।

পণ্ডিত মশাই, মহারাজার একান্ত ইচ্ছা, আপনার ছেলের লেখাপড়ার বিধিব্যবস্থা তিনিই করেন। অনুগ্রহ করে আপনি যদি সম্মতি দেন. . . .

কী আশ্চর্য! এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা।

ঠাকুরদাস একটু থেমে বলেন, আপনি দয়া করে মহারাজাকে বলবেন, আমি দু'এক মাসের মধ্যেই শ্রীমান'কে নিয়ে আসবো।

হ্যাঁ, ঠিক দু'মাস পর ঠাকুরদাস মুখুজ্যে শ্রীমান গুরুদাসকে নিয়ে কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে হাজির হয়ে

বললেন, ঈশ্বরের কৃপায় ও আপনার আশীর্বাদে শ্রীমানের যে কল্যাণ হবে, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

মহারাজা বললেন, পণ্ডিত মশাই, আপনার পুত্র যে অসম্ভব মেধাবী ছাত্র, তা আমি জানি। এইরকম ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাপারে কিছু করতে পারলে আমি সত্যি আনন্দ পাই।

তা জানি বৈকি!

তাছাড়া আরো একটা কথা।

মহারাজা মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলেন, আপনার মত জ্ঞানী-গুণী-মহাপণ্ডিতদের সাংসারিক চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত রাখাও তো আমাদের কর্তব্য।

যাই হোক এই গুরুদাস মাত্র একুশ বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বয়ং স্যার আশুতোষের হাত থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং তাঁরই অভিপ্রায়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। অবশ্য এর অনেক আগেই ঠাকুরদাসের মৃত্যু হয়।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ই গুরুদাসের জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে। সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় হৃদয়নাথ ভট্টাচার্যকে গুরুদাস অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন এবং নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য তাঁর বাঁদুড়বাগানের বাড়িতে যেতেন।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গুরুদাস দ্বারভাঙ্গা গিয়েছিলেন এক সহপাঠীর অনুরোধে। আসার দিন এই সহপাঠী তাঁকে এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম উপহাব দেন। গুরুদাস হাসতে হাসতে বলেন, আরে ভাই, এত আম কে খাবে? তুমি কী জানো না, আমার বাবা-মা ভাই-বোন কেউ নেই?

বন্ধুও হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, শুধু এইটুকুই জানি না, জানি তুমি এখনও সংসারী হও নি।

তবে?

ভাই, এখানে এক ঝুড়ির কম আম বিক্রি হয় না। কিছু আম তুমি তোমার দু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রিয় অধ্যাপকদের দিয়ে দিও।

কলকাতা পৌঁছবার পরদিনই গুরুদাস প্রায় আধ ঝুড়ি আম নিয়ে মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে হাজির। পিতৃতুল্য এই পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে প্রণাম করে গুরুদাস বললেন, এগুলি দ্বারভাঙ্গার ল্যাংড়া। অনুগ্রহ করে আপনি খেলে খুব আনন্দ পাবো।

তুমি যখন এনেছ, তখন নিশ্চয়ই খাবো কিন্তু আজ নয়, কাল।

আমগুলি খুবই সুপক্ক। আজ খেলেই ভাল হয়।

না, বাবা, আজ খাবো না।

গুরুদাস একটু ভেবে প্রশ্ন করেন, আজ না খাবার কী কোনও বিশেষ কারণ আছে?

হ্যাঁ, বাবা, আজ একাদশী।

আজ একাদশী বলে ফলও খাবেন না?

আগে খেতাম কিন্তু গত চার বছর ধরে একাদশীর দিন নির্জলা উপবাস করি।

হঠাৎ চার বছর ধরে নির্জলা উপবাস করছেন কেন?

গুরুদাস মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এই বয়সে আপনার তো নির্জলা উপবাস করা শরীরের পক্ষে আদৌ ভাল না।

বৃদ্ধ অধ্যাপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কী করবো বাবা! ন' বছরের মেয়েটা যদি নির্জলা উপবাস করে, তাহলে আমি তার পিতা হয়ে কী করে খাওয়া-দাওয়া করি বলতে পারো?

আপনার মেয়ে নির্জলা উপবাস করেন কেন?

উনি একটু ম্লান হেসে বললেন, বাবা, সবই অদৃষ্ট!

তারপর একটু থেমে বললেন, আমার কন্যাকে দেখতে সাক্ষাৎ প্রতিমা। কাটোয়ার শ্রীনিবাস তর্কচূড়ামণি তাকে দেখেই নিজের পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন, কিন্তু আমাদের এমনই অদৃষ্ট যে বিয়ের তিন মাসের মধ্যে গঙ্গায় এক নৌকাডুবিতে বাবাজীবনের মৃত্যু হয়।

কী দুর্ভাগ্যের ব্যাপার!

হ্যাঁ, বাবা, খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

তখন আপনার মেয়ের কত বয়স?

ও তখন ঠিক ন' বছরের।

চার বছর আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে?

হ্যাঁ, বাবা।

কয়েক দিন আপনমনে তর্ক-বিতর্ক চিন্তাভাবনা করার পর গুরুদাস একদিন ঐ বৃদ্ধ অধ্যাপকের বাড়িতে হাজির হয়ে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি একটা বিশেষ বিষয়ে একটু আলোচনা করতাম।

হ্যাঁ, বাবা, বলো।

আপনি কি স্বীকার করেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত?

একশ'বার স্বীকার করি।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, তবে একথাও জানি, শাস্ত্রসম্মত হলেই যে সবকিছু সমাজ মেনে নেবে, তার কোনও বাধ্যকতা নেই।

গুরুদাস বললেন, আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার দুঃসাহস আমার নেই। তবে শুধু এইটুকু নিবেদন করবো, যদি আপনার ও মাতৃদেবীর অনুমতি লাভ করি, তাহলে আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত।

উনি একটু থেমে বলেন, আমার পিতামাতা জীবিত নেই বলে আমাকেই এই প্রস্তাব করতে হল বলে দয়া করে ক্ষমা করবেন।

মহামহোপাধ্যায় অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি কী জানো, আমার বিধবা কন্যাকে বিবাহ করলে তোমার সামাজিক জীবনে নানা সঙ্কট দেখা দিতে পারে?

গুরুদাস একটু হেসে বলেন, ব্যতিক্রম কিছু করলেই যে কিছু সমস্যা বা সঙ্কট দেখা দেয়, তা আমি জানি কিন্তু তার মোকাবিলা করার মত আত্মবিশ্বাস আমার আছে।

তুমি এই বিয়ে করলে তোমার পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করা হয়তো অসম্ভব হয়ে উঠবে, তা জানো?

আইনতঃ কর্তৃপক্ষ কিছুই করতে পারবেন না ; তবে ছাত্র-অধ্যাপকদের একটা অংশ যে আমার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

উনি একটু থেমে একটু হেসে বলেন, সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা না করলেও আমি আশা করি, বেঁচে থাকবো।

মহামহোপাধ্যায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, বাবা, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

প্রায় মাস ছয়েক পর মহামহোপাধ্যায় হৃদয়নাথ ভট্টাচার্যের বিধবা কন্যা কাত্যায়নী দেবীকে গুরুদাস বিয়ে করেন।

এই বিয়ের ব্যাপারে শুধু সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে না, ঝড় উঠেছিল সমাজের নানা মহলে কিন্তু গুরুদাস বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। হাসি মুখে উপেক্ষা করেছিলেন রক্ষণশীলদের অপমান আর উপেক্ষা।

একদিন এক অধ্যাপক হাসতে হাসতে গুরুদাসকে বললেন, আরে মশাই, ছাত্ররা যখন আপনার কাছে পড়তে চায় না, আপনার ক্লাসে যায় না, তখন চাকরিটা ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

অন্য একজন অধ্যাপক পাশ থেকে টিপ্পনী কাটলেন, ছাত্রদের না পড়িয়ে

মাইনে নিতে তো লজ্জা হওয়া উচিত।

গুরুদাস গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, আপনারা অযাচিতভাবে আর কোন উপদেশ দেবেন কী?

উনি একটু থেমে বললেন, অধ্যাপক হিসেবে আমার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ানো এবং আমি সে দায়িত্ব ষোল আনা পালন করছি। ছাত্রদের কর্তব্য অধ্যয়ন করা। তারা যদি সে কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তারা যথোচিত ফলভোগ করবে।

কিন্তু বেঞ্চিগুলো তো ছাত্র না। বেঞ্চিগুলোকে পড়িয়ে কী লাভ?

আমি নীচ হীন সুদখোরদের মত লাভ-লোকসানের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহী না। আমার কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে, সততার সঙ্গে কর্তব্য পালনই বড় কথা।

সব খবরই স্যার আশুতোষের কাছে পৌঁছেছিল। তাইতো তিনি একদিন গুরুদাসকে ডেকে বললেন, তোমার মত চরিত্রবান, আদর্শবান ও বিদ্বানকে আমার বিশেষ দরকার।

আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনার ইচ্ছা আমি নিশ্চয়ই পূর্ণ করতে দ্বিধা করবো না।

তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অব্ কলেজেস্ হতে হবে।

স্যার, আমি কী তার উপযুক্ত?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, স্যার, ঐ পদে তো অত্যন্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকরাই . . . .

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই স্যার আশুতোষ বললেন, হ্যাঁ, এ পর্যন্ত তাই হয়েছে।

উনি একটু থেমে বললেন, প্রবীণ অধ্যাপকদের অনেক সহপাঠী বা বন্ধুরা নানা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তাইতো ওরা প্রিন্সিপ্যালদের সমালোচনা করতে বড্ড দ্বিধা করেন। তোমার মধ্যে এইসব দুর্বলতা থাকবে না বলেই আমি আশা করি।

গুরুদাস স্যার আশুতোষকে প্রণাম করে বললেন, স্যার, আপনি আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন আপনার আস্থা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারি।

স্যার আশুতোষ ওঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, যে মহামহোপাধ্যায় মশায়ের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, তার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

সেদিন বাসায় ফিরেই গুরুদাস স্ত্রীর দুটি হাত ধরে বলেছিলেন, তোমাকে বিয়ে করে আমি যে সম্মান পেলাম, তা আমার স্বপ্নাতীত ছিল। সত্য তুমি সাক্ষাৎ

ভগবতী!

খুব ছোটবেলায় একদিন নিবারণকাকাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা বলছিল, তুমি আর বাবা একসঙ্গে পড়তে। সত্যি নাকি?

নিবারণকাকা এক গাল হাসি হেসে বলেছিল, হ্যাঁ, সত্যি; তবে বলার মত কিছু না।

তার মানে?

তোমার ঠাকুর্দা স্বর্গীয় গুরুদাস বাঁড়ুজ্যে যেমন মহাপণ্ডিত ছিলেন, সেইরকমই বড় চাকরি করতেন কলকাতায় কিন্তু প্রত্যেক বছর দু'তিন মাস গ্রামে কাটাতেন।

ও একটু থেমে একটু উত্তেজিত হয়ে বলে, আমাদের চণ্ডীতলার স্কুল তো উনিই তৈরি করেন। ঐ স্কুলবাড়ির প্রত্যেকটা ইট-কাঠ ওনারই পয়সায় কেনা।

আমি চুপ করে ওর কথা শুনি।

নিবারণকাকা মাথা নেড়ে বলে, তখন তো গ্রামের বামুন-কায়েতদের বাড়ির ছেলেরা ছাড়া কেউ পড়াশুনা করতো না কিন্তু পড়াশুনা করার জন্য তাদের যেতে হতো সাত-আট মাইল দূরের কেশবপুরের স্কুলে। প্রথমদিকে তোমার ঠাকুর্দার স্কুলে ওরা পড়তে এলো না।

কেন?

তোমার ঠাকুর্দা যে বিধবা বিয়ে করেছিলেন, তাই . . . .

নিবারণকাকা কথাটা শেষ না করেই একটু থেমে আবার বলে যায়, তখন তোমার ঠাকুর্দা আমাদের মত চাষাভুষাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলে জোগাড় করে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

এবার ও একটু হেসে বলে, সেই সময় আমি আর তোমার বাবা একই সঙ্গে পড়তাম।

আমি এক গাল হেসে বলি, তার মানে, তুমি বাবার ক্লাসফ্রেণ্ড !

কী যে বল তুমি! আমি তিন বার চেষ্টা করেও পাঁচ ক্লাস পার হতে পারলাম না আর তোমার বাবা লাফাতে লাফাতে উপরে উঠে গেল।

নিবারণকাকা হঠাৎ একটু থেমে চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, তবে তোমার ঠাকুর্দা আমাকে লেখাপড়া ছাড়তে দিলেন না। একদিন আমার বাবাকে ডেকে উনি বললেন, গদাধর, তোমার ছেলেকে আর স্কুলে যেতে হবে না। নিবারণ আমার কাছেই থাক। ওকে বাড়িতেই পড়াবো।

তুমি কী পড়তে?

ইতিহাস. ভূগোল, অঙ্ক আর বাংলা।

আর কিছু পড়তে না?

না।

ও একটু থেমে বলে, তোমার ঠাকুর্দা বলতেন, নিবারণ, এই চারটে বিষয়ে যদি তোর একটু জ্ঞান থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে তোর কোনও কষ্ট হবে না।

নিবারণকাকা আমার দিকে তাকিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেসব দিনের কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না।

আমি দুম করে প্রশ্ন করি, কেন ভুলতে পারবে না?

সত্যি বলছি মানিক, তোমরা ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে আমি ঠিক ভগবানের মতই ভক্তি করতাম। ওঁরা দু'জনে কি ভাল ছিলেন, তা বলে শেষ করতে পারবো না।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, আমি সামান্য চাষীর ঘরের ছেলে হলেও ওঁরা দু'জনে আমাকে ঠিক নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। তোমার বাবা আর আমি ঠিক দু'ভায়ের মতনই বড় হয়েছি।

আমি একটু থেমে বলি, বাবাও তোমাকে খুব ভালবাসেন, তাই না নিবারণকাকা?

নিবারণকাকা এক গাল হাসি হেসে বলে, ভালবাসে মানে? ও আমাকে ছেড়ে থাকতেই পারে না।

ও প্রায় না থেমেই বলে, বৌঠানও হয়েছেন তেমনি। আমাকে হাতের কাছে না পেলেই চোখে অন্ধকার দেখেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নিবারণকাকা বলে, তোমার বাবা-মা যে আমাকে কত ভালবাসে, বিশ্বাস করে, তাও বলে শেষ করতে পারবো না।

ও একটু থেমে বলে, বুঝলে মানিক, তোমার বাবার যখন বিয়ে হয়, তখন ও কেষ্টনগরে এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে ওখানকার স্কুলেই চাকরি করে আর মাঝেমধ্যে চণ্ডীতলায় আসে।

তখন মা কোথায় থাকতেন?

তখন তোমরা ঠাকুমা, মা আর আমি চণ্ডীতলাতেই থাকতাম।

তারপর?

তোমার বাবার বিয়ের বছর দেড়েক পরই তোমার ঠাকুমা মারা যান। তখন আমি আর বৌঠান চণ্ডীতলাতেই থাকি আর তোমার বাবা যথারীতি মাসে দু'একবার কেষ্টনগর থেকে আসে।

হঠাৎ নিবারণকাকা বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার বাবা আমার ভরসায় বৌঠানকে চণ্ডীতলায় রেখে নিজে কেষ্টনগরে থাকে বলে কত জনে কত আজেবাজে কথা পর্যন্ত বলেছিল। আমি নিজেও চলে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওরা দু'জনে আমাকে কিছুতেই যেতে দিল না।

আমি আবার একটু হেসে বলি, তোমার বিয়ে তো মা দিয়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, তোমার ঠাকুর্দাই আমাদের দুটো টিনের ঘর তৈরি করে দেন। আবার তোমার ঠাকুমাব কথামত উনি কিছু জমিজমাও করে দেন।

তারপর আমাদের কাটোয়ার এই অজয় আর ভাগীরথী দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে। বুকে ব্যথা নিয়েই বাবা স্কুল থেকে ফিরলেন কিন্তু ডাক্তার এসে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পরের দিন থেকেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা শুরু হলেও আমি পরীক্ষা দিতে পারলাম না। সব বন্ধুবান্ধব পাস করে কলেজে ভর্তি হল কিন্তু আমি স্কুলেই পড়ে রইলাম। পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনেই পাস করে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম।

এদিকে বাবার মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হল অভাব-অনটন। তাছাড়া আমাদের এই পুরনো বাড়িটা নিয়েও নিত্যনতুন সমস্যা দেখা দিল। আজ শোবার ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে তো দু'দিন পর রান্নাঘরের দরজার একটা পাল্লা ভেঙে পড়ে। কোনমতে একটা সমস্যা মিটতে-না-মিটতেই আরো পাঁচটা নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়। মা বা নিবারণকাকা আমার গায়ে আঁচড়টি লাগতে না দিলেও আমি সবই বুঝতে পারি। এরই মধ্যে ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠলাম। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে কিছু আয় করতেই হবে।

ঠাকুদরার পুরনো বৈঠকখানা ঘরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে দেখেই মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, এই ঘরে কী করবি?

সামনের পয়লা তারিখ থেকে দু'তিনটে ছেলে আমার কাছে পড়তে আসবে। এই ঘরেই ওদের পড়াবো বলে . . .

ওদের পড়ালে যে তোর পড়াশুনার ক্ষতি হবে।

না, না, কিচ্ছু হবে না।

তিনটি ছাত্র পড়িয়ে প্রথম মাসে আয় হল নব্বই টাকা। পরের মাসেও তাই।

তারপর আরো দুটো ছাত্র জুটে গেল। অর্থাৎ তৃতীয় মাস থেকে দেড়শ টাকা আয় করতে শুরু করলাম।

ছ' মাস পরে বার্ষিক পরীক্ষায় আমার পাঁচটি ছাত্রই বেশ ভাল নম্বর পেয়ে প্রমোশন পেল। আর ওদের মধ্যে দুটি ছাত্র তো অভাবনীয় ভাল নম্বর পাওয়ায় শিক্ষক হিসেবে আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল কাটোয়ার ঘরে ঘরে। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য শুরু হল এর-ওর অনুরোধ।

কাটোয়ার বিশিষ্ট শিক্ষক জগদীশ সরকার একদিন সাত সকালে হাজির হয়ে বললেন, মানিক, দুঃখের কথা কি বলব। স্কুলে আমি নাকি ভাল পড়াই ; শুনি, অনেক ছেলেই আমার জন্য ভালভাবে পাস করে কিন্তু আমার নিজের মেয়ে পর পর দু'বার ক্লাস নাইন'এ ফেল করল। লক্ষ্মী ভাই, তুমি আমার মেয়েটাকে একটু দেখো। তোমার প্রাপ্য সম্মান দিতে আমি ত্রুটি করবো না।

আমি একটু হেসে বলি, দাদা, আমি অভাবের জন্য ছাত্র পড়ালেও কারুর কাছে কোন দাবি করি না। যে যা দেয়, আমি হাসিমুখেই তা নিই। আপনি আমাকে এক টাকা দিলেও আমি বিন্দুমাত্র অখুশি হবো না। . . .

না, না, আমি নিজে শিক্ষক হয়ে অমন অন্যায় করতে পারবো না।

কিন্তু দাদা, আমার কাছে তো শুধু ছেলেরাই পড়ে। আপনার মেয়েকে পড়াতে হলে তো ওকে সাড়ে সাতটা-আটটার সময় আসতে হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই আসবে।

জগদীশবাবু একটু থেমে বলেন, তুমি বাড়িতে বসে আমার মেয়েকে পড়াবে, তার আবার সময়-অসময় কী?

ঠিক আছে; ওকে সামনের সোমবার থেকেই পাঠিয়ে দেবেন। তবে . . .

আমি হঠাৎ থামতেই উনি জিজ্ঞেস করেন, তবে কী?

আমি মুখ নীচু করে বলি, হাজার হোক, আমি এখনও কলেজে পড়ি। বয়সও বেশি না। তাই আপনার মেয়েকে একলা একলা পড়াবার চাইতে ক্লাস নাইন'এর আরো দু'একটি মেয়ে ওর সঙ্গে এলে ভাল হয়।

জগদীশবাবু একুট হেসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, তুমি কোন বংশের ছেলে, তা আমি খুব ভাল করেই জানি। তোমাকেও আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। তাই তোমার কাছে আমার মেয়ে একলা পড়লেও আমি ষোল আনা নিশ্চিন্ত থাকবো।

উনি একটু থেমে বললেন, তবে তুমি যখন বললে, তখন দুটো-একটা কেন, আমি দশটা মেয়েকে পাঠাতে পারি।

আমি একটু হেসে বলি, না, না, তার দরকার হবে না। আপনার মেয়ের সঙ্গে

আরো দু'একজন থাকলেই যথেষ্ট।

ঠিক আছে, তাই পাঠাবো।

শুধু জগদীশ সরকার না, এই ধরনের অনুরোধ এলো আরো অনেকের কাছ থেকে। সবার অনুরোধ রাখা সম্ভব হল না। যাদের অক্ষমতা জানালাম, তাদের মধ্যে দু'চারজন মা'কে ধরল।

রাত্রে খেতে বসতেই মা বললেন, হ্যাঁরে মানিক, আজ হরেন ডাক্তারের বউ আমার কাছে এসেছিল।

কেন?

কেন আবার? তুই বুঝি ওর ছেলেকে পড়াতে পারবি না বলেছিস।

আমি তো স্কুল খুলিনি যে একসঙ্গে পঁচিশ-তিরিশ জন ছেলেকে পড়াবো।

একটু থেমে আমি বলি, হরেনকাকা হাজার বার বললেও আমি সকালে ওঁর ছেলেকে পড়াতে পারবো না। সকালে ছাত্র পড়ালে আমি নিজে পড়াশুনা করবো কখন?

নিবারণকাকা বললে, ঠিকই তো!

মা বললেন, যাই হোক বাবা, তুই ওদের ছেলেটাকে যখন হোক পড়াতে রাজি হয়ে যা।

উনি একটু থেমে বললেন, আমাকে এমন করে ধরেছিল যে আমি একরকম কথা দিয়ে ফেলেছি।

তুমি যখন কথা দিয়েছ, তখন নিশ্চয়ই পড়াবো কিন্তু আর কাউকে এরকম কথা দিও না।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমি তিন দলে ভাগ করে মোট একুশ জন ছেলেমেয়েকে পড়াতে শুরু করলাম। ভাল আয় করতেও শুরু করলাম। সংসারের চেহারাও বদলে গেল। মাঝে-মধ্যে নিবারণকাকা মিস্ত্রি ডেকে এনে ভাঙা দরজা-জানলা মেরামত পর্যন্ত করাতো। সবকিছু দেখেশুনে আমার বেশ ভাল লাগতো কিন্তু এতগুলো ছেলেমেয়ে পড়িয়ে সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। আগের মত আর ভোর পাঁচটায় কিছুতেই উঠতে পারতাম না। বিছানা ছেড়ে উঠতে ছ'টা-সাড়ে ছ'টা হয়ে যেতো। তাইতো সকালবেলায় ঘণ্টা দুয়েকের বেশি কিছুতেই পড়ার সময় পেতাম না। তবু অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করলাম বলে আমিই অবাক হয়ে গেলাম।

অনেকেই পরামর্শ দিলেন, কলকাতায় গিয়ে এম. এ. পড়তে। মা'র নিজেরও

ইচ্ছা ছিল, আমি এম. এ. পাস করি কিন্তু আমি রাজি হলাম না। বললাম, মা, আজকালকার দিনে শুধু এম. এ. পাস করে কোনও লাভ নেই । . . .

কেন? কলেজে পড়াবি?

না, মা, আজকাল শুধু এম. এ. পাস করেই কলেজে পড়ানো যায় না। গবেষণা করে ডক্টরেট হতে হয়। কিন্তু ডক্টরেট হয়েও যে কলেজে পড়াবার সুযোগ পাবো, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই।

তাহলে?

আমি একটু হেসে বলি, তাহলে আবার কী? যেমন আছি তেমনই থাকবো।

একটু থেমে বলি, এবার থেকে সকাল-বিকেল ছেলেমেয়ে পড়িয়ে দু'হাতে আয় করবো।

তুই কী স্কুলে মাস্টারির চাকরিও পাবি না?

পেতে পারি কিন্তু তার জন্যও প্রচুর টাকা দরকার।

এ আবার নতুন কথা কি শোনাচ্ছিস?

আমি একটু থেমে বলি, হ্যাঁ, মা, আজকাল স্কুলে মাস্টারির চাকরি পেতে হলে স্কুলে বা স্কুল কমিটির পাণ্ডাদের অথবা রাজনৈতিক দলের দাদাদের থলি-ভর্তি টাকা দিতে হয়।

বলিস কীরে!

হ্যাঁ, মা, ঠিকই বলছি।

এ রাম! রাম! কী ঘেন্নার কথা!

না, আমি এম. এ. পড়তে কলকাতায় গেলাম না, মাস্টারির চাকরির চেষ্টাও করলাম না। সকাল-সন্ধেয় ছেলেমেয়ে পড়িয়েই আমি বারো শ'—চোদ্দো শ' টাকা আয় করতে শুরু করলাম।

দুই

দিনগুলো বেশ কেটে যায়। এখন আবার আমি ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পড়ি। ভোর ছ'টায় মেয়েরা পড়তে আসে। সাড়ে আটটার মধ্যেই ওদের ছেড়ে দিই। ওরা চলে যাবার পর আমি বিকেল-সন্ধে বেলার ছেলেদের খাতাপত্তর দেখি। প্রতিদিনই আমাকে এই খাতাপত্তর দেখতে হয়; কারণ প্রতিদিনই আমি ছেলেমেয়েদের অন্তত একটা করে প্রশ্ন লিখতে দিই।

ঐ খাতাপত্তর দেখতে দেখতেই জলখাবার খাই। আবার যদি এরই মধ্যে

খবরের কাগজ এসে যায়, তাহলে মোটামুটি খবরগুলোর উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

এগারোটা—সাড়ে এগারোটা নাগাদ দাদুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে মা'র রান্নাঘরে এসে হাজির হই। প্রত্যেক দিন এই সময় মা আর নিবারণকাকার সঙ্গে চা খেতে খেতে একটু গল্প না করে থাকতে পারি না।

জানো মা, আমার ছাত্রছাত্রীরা ধরেছে ওদের সবাইকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, ওরা পিকনিক করবে।

তা তুই কি বললি?

এখনও কিছু বলিনি; তবে ভাবছি, একদিন ওদের সবাইকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসবো।

কোথায় যাবার কথা ভাবছিস?

আমি একটু হেসে বলি, এইসব ছেলেমেয়েগুলো তো মামার বাড়ি-পিসির বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যায়নি বললেই হয়।

একটু থেমে বলি, তাইতো যেখানে হোক নিয়ে গেলেই হয়।

নিবারণকাকা একটু হেসে বলে, তোমার মত ঝোলা কাঁধে নিয়ে যখন-তখন বেরিয়ে পড়ার বাতিক তো সবার হয় না।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, নিবারণকাকা, শুধু বইয়ের পাতা মুখস্থ করলেই শিক্ষিতও হওয়া যায় না, জ্ঞানলাভও হয় না। যারা চাষ-আবাদ করে, তারা মেঘ দেখেই বলে দেয়, বৃষ্টি হবে কিনা বা কখন বৃষ্টি হবে কিন্তু বিশ-পঁচিশ বছর পড়াশুনা করার পরও অনেক পণ্ডিত তা বলতে পারেন না।

ঠিক বলেছ।

আমি বলে যাই, আমাদের দেশের ক' জন মা-ঠাকুমা স্কুল-কলেজে পড়েছেন? তাঁরা চোখ দিয়ে দেখে আর কান দিয়ে শুনেই তো সবকিছু শেখেন বলে ঠিক সংসার-ধর্ম করতে পারেন।

মা বললেন, সত্যিই তাই।

আমি চাই, আমার ছাত্রছাত্রীরাও পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় শিক্ষাও কিছু পেয়ে বড় হোক।

নিবারণকাকা এক গাল হাসি হেসে বলে, আজ বাজারে হরেন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তা তো বুঝলাম কিন্তু হাসির কী কারণ ঘটল?

তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ওর মেয়ে মোটামুটি ভালভাবেই পাস করেছে বলে ভদ্রলোক খুব খুশি।

মা জিজ্ঞেস করলেন, ওর মেয়েটা আগে ফেল করতো কেন?

একে মেয়েটার বয়স একটু বেশি বলে দু'তিনজন দিদিমণি ওকে একটু খোঁচা দিয়ে কথাবার্তা বলতেন বলে ও স্কুলে গিয়ে বড্ড অস্বস্তিবোধ করতো।

একটু থেমে বলি, তাছাড়া আগে যে ভদ্রলোক ওকে বাড়িতে পড়াতে যেতেন, তিনি হয় ফাঁকি দিতেন, না হয় পড়াতে জানেন না।

হ্যাঁ, তাই হবে। তা না হলে মেয়েটা এবার ভাল নম্বর পেয়ে পাস করল কীভাবে?

জানো মা, মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, মা।

আমি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলি, হরেন ডাক্তার যদি দুম করে মেয়েটার বিয়ে না দেন, তাহলে ও হেসে-খেলে এম. এ. পাস করবে।

তার মানে মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমতী?

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বলি, আমাদের অধিকাংশ বাবা-মা আর মাস্টার মশাইরা সব সময় ছেলেমেয়েদের নিন্দা করেন। কথায় কথায় বলেন, তোদের দ্বারা কিছু হবে না।

মা অবাক হয়ে আমার কথা শোনেন।

হরদম নিন্দা করলে ছেলেমেয়েদের নিজেদের ওপর আস্থা চলে যায়। তারজন্যই অনেক ভাল ভাল ছেলেমেয়েও খারাপ রেজাল্ট করে।

এবার আমি একটু হেসে বলি, আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিই যে ওদের দ্বারা সবকিছু সম্ভব। শুধু নিষ্ঠার সঙ্গে একটু চেষ্টা করতে হবে। ব্যস! আর কিছু চাই না।

নিবারণকাকা এক গাল হাসি হেসে বলে, বৌঠান, মানিক ঠিক ওর ঠাকুর্দার মত কথা বলল। উনিও আমাকে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন।

দুপুর বেলায় খেয়েদেয়ে আমি ইংরেজি খবরের কাগজটা ভাল করে পড়ি। বাংলা খবরের কাগজখানা তখন মা পড়েন বলে আমি ওটা রাত্তিরে পড়ি। এছাড়া কোনও-না-কোনও বই পড়ি। বিকেলবেলায় মা আর নিবারণকাকার সঙ্গে চা খেতে-না-খেতেই ছেলেরা আসতে শুরু করে। দু' ব্যাচ ছেলেকে পড়িয়ে আমার ছুটি হতে হতে দশটা বেজে যায়।

রবিবার আমার খেয়াল-খুশি মত চলি। তবে সকাল-সন্ধ্যেয় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা না দিয়ে থাকতে পারি না। এছাড়া বেশ কিছুক্ষণ পড়াশুনা করবই।

আমি সব টাকাকড়িই মা'র হাতে তুলে দিই। মা নিবারণকাকার সাহায্যে সংসার চালান। বাড়ি-ঘর বা সংসারের ব্যাপারে আমাকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হয় না। তাইতো আমার দিনগুলো বেশ ভালই কেটে যায়। আমার কিছু দরকার হলে মা'কে বলি, মা, নিবারণকাকাকে বলো তো, ইন্দুদা'র দোকান থেকে আমার দু'টো পায়জামা আর দুটো পাঞ্জাবি আনতে।

কাল যখন নিবারণ বাজারে যাবে, তখনই এনে দেবে।

এইভাবেই কেটে যায় মাসের পর মাস, ঘুরে যায় বছর। দেখতে দেখতে আরো দুটো বছর চলে গেল। আমার ছাত্রছাত্রীদের প্রথম দলের হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা শেষ হবার পর ফলও বেরুল। ওদের মত আমিও একটু উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম ফলাফল জানার জন্য। মনে মনে ভাবছিলাম, ওরা ভাল ফল না করলে আমার ভবিষ্যৎও অন্ধকার। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পরিনি, আমার বারোজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ন'জন ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করবে। অন্য তিনজন সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করেছে। তার মধ্যে শৈবাল মাত্র সাত নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন পায়নি। তবে সব চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার হরেন ডাক্তারের মেয়ে নমিতার ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া।

হরেন ডাক্তার তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ছুটে এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। আমাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, মানিক, তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র। তা না হলে আমার মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে?

ভাবাবেগের আতিশয্যে উনি আমার আরো কত প্রশংসা করলেন। আনন্দে খুশিতে ওঁর স্ত্রী কত কথা বললেন। নমিতা আমাকে প্রণাম করে হাসতে হাসতে বলল, আমি কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার পরও আপনার কাছে পড়বো।

তাই কী হয় নমিতা? বি.এ. পাস করে কী বি.এ. ক্লাসের ছেলেমেয়েদের পড়ানো যায়?

ওর মা বললেন, নমিতা এম. এ. পড়লেও তোমার কাছেই পড়বে।

ওরা থাকতে-থাকতেই অন্য ছাত্রছাত্রীরাও এসে হাজির। অনেকের বাবা-মা বা দাদা-দিদিরাও সঙ্গে এসেছেন আমাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে।

বাড়িতে যেন বিজয়োৎসব শুরু হয়ে গেল। এরই মধ্যে নিবারণকাকা ছুটে গিয়ে রসগোল্লা কিনে এনেছে। মা সবাইকে সেই রসগোল্লা খাওয়ালেন।

যে তিনজন ছেলেমেয়ে সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়েছে, তাদের বললাম, বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস পড়লে দেখবে, বহু বিখ্যাত সেনাপতি প্রথমে পরাজয় স্বীকার করে পিছিয়ে এসেছেন। তারপর ওরা এমন পাল্টা আঘাত করেছেন যে শত্রুপক্ষ

পালাবার পথ খুঁজে পায়নি।

একটু থেমে একটু হেসে বললাম, তোমাদের সেইরকম পাল্টা আক্রমণ করে বি.এ.'তে অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করতে হবে।

শৈবাল বলল, আপনি সাহায্য করলে নিশ্চয়ই পারবো।

নমিতা সঙ্গে সঙ্গে ওদের বলল, আমি বলে দিয়েছি, আমি রেগুলার পড়তে আসবো।

ওর কথা শুনে সব ছেলেমেয়েই হৈ হৈ করে উঠল। অনেকের বাবা-মা দাদা-দিদিরাও আমাকে অনুরোধ করলেন ওদের পড়াতে। আমি আমার অক্ষমতা ও অসুবিধার কথা বললাম কিন্তু ওঁরা মানতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত বললাম, আচ্ছা, আমাকে একটু ভাবতে দিন।

তখনকার মত ওঁরা সবাই চলে গেলেন।

এর পর শুরু হল ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া। খাওয়া-দাওয়ার পর হরেন ডাক্তার আমার হাতে একশ' টাকার কয়েকটা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, মানিক, তোমার ঋণ তো শোধ করতে পারবো না। তবু তুমি যদি এই সামান্য হাজারটা টাকা নাও, তাহলে খুশি হবো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা সামনের টেবিলের উপর রেখে বললাম, নমিতাকে পড়িয়ে তো আমি টাকা পেতাম। তবে আবার এখন . . . .

না, না, বাবা, তুমি ওটা ফিরিয়ে দিও না।

না, না, এ টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারবো না।

অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর বললাম, বরং এই টাকা দিয়ে নমিতাকে কিছু রেফারেন্স বই কিনে দিন।

শুধু উনি না, আরো কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর বাবা আমাকে ঠিক এইভাবেই টাকা দিতে চাইলেন। না, আমি কারুর কাছ থেকেই টাকা নিলাম না। সবাইকেই ঐ টাকা দিয়ে বই কিনতে বললাম।

দিন কয়েক পর ঐসব ছাত্রছাত্রী আমার কাছে এসে বলল, মানিকদা, আমাদের এই সাত হাজার টাকা দিয়ে আপনার বাড়িতেই একটা লাইব্রেরি হোক। তাহলে আমরা সবাই সমানভাবে বইগুলো ব্যবহার করার সুযোগ পাবো।

আমি একটু হেসে বললাম, লাইব্রেরি আমার এখানে হলে তোমাদের চাইতে আমার বেশি কাজে লাগবে।

একটু থেমে বললাম, ঠিক আছে। তোমরা দু'তিনজন আমার সঙ্গে চল, একদিন কলকাতা গিয়ে বইগুলো কিনে আনি।

নমিতা জিজ্ঞেস করল, আপনি বলুন, আমাদের মধ্যে কে কে আপনার সঙ্গে যাবে।

তোমার বাবা যখন প্রথম টাকা অফার করেছেন, তখন তুমি যাবেই।

দু'তিনজন ছেলে প্রায় একসঙ্গে বলল, মানিকদা, ও আর শৈবাল আপনার সঙ্গে যাক। ওরা দু'জন গেলেই যথেষ্ট, কী বলেন?

ঠিক আছে; ওদের দু'জনকে নিয়েই যাবো।

পরের দিন সকালেই নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে ওর মা এসে হাজির। উনি বললেন, মানিক, আমার এক ভাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল। তাঁর কথা মনে আছে কী?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে। মুহূর্তের জন্য থেমে বললাম, অমিত না অমিতাভ বসু নাম না?

হরেন ঘোষের স্ত্রী খুশির হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

উনিও একটু থেমে বললেন, ও তো রেলের খুব বড় অফিসার। তাই কি কাজে যেন এদিকে এসেছিল বলে এক রাত আমাদের কাছে থেকে আজ সকালেই কলকাতা ফিরে গেল।

ও !

নমিতা যখন তোমার সঙ্গে কলকাতা যাচ্ছে, তখন ও বার বার করে বলেছে, ওর কাছে একটা রাত কাটিয়ে ফিরতে।

আমি একটু হেসে বলি, কলকাতায় রাত কাটাবার সুযোগ পেলেই আমি থিয়েটার দেখি।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখবে।

তাহলে তো বৃহস্পতি বা শনিবার যেতে হয়।

নমিতা বলল, মানিকদা, আমাকেও থিয়েটার দেখাবেন তো? আমি কোনদিন কলকাতার থিয়েটার দেখিনি।

তোমার মা অনুমতি দিলে দেখাতে পারি।

ওর মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তোমার সঙ্গে যাবে, তার আবার অনুমতি!

নমিতাকে বললাম, তাহলে বৃহস্পতিবার ভোর ছ'টা কুড়ির ট্রেনেই আমরা রওনা হবো। তুমি শৈবালকে বলে দিও, আমরা পরের দিন ফিরব।

নমিতা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, বলে দেব।

তবে আগে থেকে থিয়েটার দেখার কথা বলো না; বাই চান্স যদি টিকিট না পাই।

না, না, বলব না।

ভারতীয় রেল অনেক কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। রাজধানী বা শতাব্দী এক্সপ্রেসের মত ট্রেন সত্যিই গর্বের কিন্তু ভারতীয় রেলের কলঙ্কের তালিকায় এক নম্বর হচ্ছে আমাদের কাটোয়া লোকাল। যে কোনো দিন যে কোনো সময়ের কাটোয়া লোকালে চড়ুন না কেন, মনে হবে, এর চাইতে জেলখানায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও অনেক বেশি আনন্দে থাকা যায়।

কাটোয়ায় আমরা তিনজনেই পাশাপাশি বসলাম। জানলার ধারে আমি, তারপর নমিতা; নমিতার ওপাশে শৈবাল। ঘণ্টা খানেক পর যখন নবদ্বীপধাম পৌঁছলাম, তখন আমাদের অবস্থা সত্যি সঙ্গীন। যে বেঞ্চে চারজন বসার কথা, সেখানে এগিয়ে পিছিয়ে ন'জন বসলে যে কি অবস্থা হয়, তা সহজেই অনুমেয়। এর উপর দু'টি বেঞ্চের মাঝখানেও লোকজন দাঁড়িয়ে। প্রত্যেক স্টেশনেই দু'চারজন নামলে উঠছেন দশজন। এই পরিস্থিতিতে নমিতার মত উনিশ বছরের যুবতী ছাত্রী পাশে থাকায় আমি লজ্জার দ্বিধায় ওর দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারি না। আমি ওর শিক্ষক হলেও তো ভুলতে পারি না, আমি তেইশ বছরের যুবক। আমি বোধহয় নিঃশ্বাস বন্ধ করেই বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি।

হঠাৎ নমিতা বলল, মানিকদা, হাত পাতুন।

আমি দৃষ্টি ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাই। মনে মনে বলি, হাত না নেড়েই শালীনতা রক্ষা করতে পারছি না। এর পর হাত দিয়ে সিঙ্গাড়া-মিষ্টি খেতে হলে তো আমাকে প্রায় অসভ্যের মত তোমার . . .

কী হল? ধরুন।

এসব আবার কিনলে কেন?

শৈবাল বলল, আমরা খাবো আর আপনি খাবেন না?

নমিতা বলল, সাড়ে দশটা-এগারোটার আগে তো ট্রেন হাওড়া পৌঁছবে না। ততক্ষণ কী আমরা না খেয়ে থাকবো?

হ্যাঁ, দাও।

কী করবো? ঐ অবস্থাতেও আমাকে খেতে হয়। সিঙাড়া-মিষ্টি আর চা খাবার পর হঠাৎ খেয়াল হল, আমি নমিতাকে প্রায় চিড়ে-চ্যাপ্টা করে বসে থাকলেও ও নির্বিবাদে শৈবালের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমার সঙ্গেও দু'একটা কথা বলছে।

সিঙাড়াটা দারুণ ছিল, তাই না মানিকদা?

হ্যাঁ, ভালই ছিল।

একটু চুপ করে থাকার পর ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, এই ট্রেনে একলা একলা গেলে আমি মরেই যেতাম। আপনি আর শৈবাল আছেন বলে এই ট্রেন জানি কী দারুণ লাগছে।

ডান দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ও বলে, তাই না শৈবাল?

সে তো একশ' বার।

আমি অবাক হয়ে নমিতার দিকে না তাকিয়ে পারি না।

ও আমার চোখের উপর চোখ রেখে চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে, কী মানিকদা, আপনার ভাল লাগছে না?

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। দু'এক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ, ভাল লাগছে। আমি বলতে পারলাম না, নমিতা, তুমি আমার ছাত্রী। তবু আমি স্বীকার করবো, আমি দেবতা না; আমি রক্ত-মাংসের মানুষ। আমার সবলতাও আছে, দুর্বলতাও আছে। তোমার মত যুবতীর এই নিবিড় সান্নিধ্য নিশ্চয়ই আমার ভাল লাগছে কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি লাগছে লজ্জা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি অন্যায় করছি বলে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

যাই হোক এইভাবেই প্রায় এগারোটা নাগাদ হাওড়া পৌঁছেই নমিতার মামাকে ফোন করলাম।

মিঃ বোস, আমরা এই মাত্র পৌঁছলাম।

ট্রেনে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে?

হ্যাঁ, তা একটু হয়েছে।

যাই হোক ছোড়দির কাছ থেকে খবর পেয়েই আমি আপনাদের তিনজনের জন্য তিনটে টিকিট কেটেছি। . . .

কীসের টিকিট কেটেছেন?

এখন কলকাতার বেস্ট নাটক হচ্ছে, বিভাস চক্রবর্তীর মাধব-মালঞ্চ-কইন্যা। তারই টিকিট কেটেছি; তবে ম্যাটিনির পাইনি, ইভনিং শো'র . . .

ভালই করেছেন।

আপনারা কী দুপুরে আমার কোয়ার্টারে খেতে যাবেন?

না, না, দুপুরে সম্ভব হবে না। একেবারে থিয়েটার দেখে আপনার ওখানে যাবো।

তাহলে ঠিক সওয়া ছ'টার মধ্যে আমার ড্রাইভার অ্যাকাদেমীর সামনে পৌঁছে যাবে। নমিতাকে ড্রাইভার চেনে। ওর কাছ থেকে টিকিট নিয়ে থিয়েটার দেখে আবার ওর সঙ্গেই আমার ওখানে আসবেন।

তার মানে একটু রাত হবে।

দশটার মধ্যেই আপনারা আমার কোয়ার্টারে পৌঁছে যাবেন। আমরা এগারোটার আগে কোনোদিনই খাই না।

কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় ঘুরে ঘুরে বইপত্তর কেনা ছাড়াও দিলখুস আর কফি হাউসে দু'-দু'বার খেয়েদেয়ে ট্যাক্সিতে বইয়ের বাণ্ডিল নিয়ে আমরা যখন অ্যাকাদেমীর সামনে পৌঁছলাম, তখন ঠিক ছ'টা কুড়ি। নমিতাকে দেখেই মিঃ বোসের ড্রাইভার এগিয়ে এসে টিকিট দিল। তারপর বইয়ের প্যাকেটগুলো ওর গাড়িতে রেখে দেবার কথা বলেই আমরা হল'এ ঢুকলাম। দ্বিতীয় সারির এক ধারের পর পর তিনটি সীট। হলের কর্মী সীট দেখিয়ে দিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নমিতা বলল, মানিকদা, আপনি মাঝখানে বসুন। আমি ধারে বসছি; শৈবাল আপনার ওপাশে বসুক।

শৈবাল বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি মাঝখানেই বসুন।

নাটকটা আমাদের তিনজনেরই খুব ভাল লাগলো। ময়মনসিং গীতিকা অবলম্বনে বিভাস চক্রবর্তী সত্যি এক অসামান্য নাটক সৃষ্টি করেছেন। তারপর মিঃ বোসের বাড়ি গেলাম। খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করে শুতে গেলাম মাঝ রাত্তিরে। পরের দিন সকালে ব্রেক ফাস্ট করে মিঃ বোস ও তাঁর স্ত্রীকে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁদেরই গাড়িতে হাওড়া রওনা হলাম।

আবার সেই কাটোয়া লোকাল। সেই একই যন্ত্রণা, একই অস্বস্তি। আসার সময়ের মত এবারও নমিতাকে নির্বিকারভাবে আনন্দে খুশিতে ভরপুর দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

স্টেশন থেকে বাড়িতে পৌঁছতেই মা বললেন, নিবারণের মা খুব অসুস্থ। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ও বাড়ি চলে গেল।

কে খবর দিল?

ওদের পাড়ার একটা ছেলে এসে খবর দিল।

কী খবর দিল?

বলল, খেতে বসার পর পরই নিবারণের মা অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে।

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে একুট উৎকণ্ঠার সঙ্গেই বললাম, সেরিব্রাল বা হার্ট অ্যাটাক না তো?

আমারও সেইরকম সন্দেহ হচ্ছে।

তিন দিন পর খবর পেলাম, আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছিল। হাসপাতালে তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্য থাকার পর নিবারণকাকার মা মারা গিয়েছেন।

মা বললেন, মানিক, তুই হাত-মুখ ধুয়ে একটু চা-টা খেয়েই একবার পোস্ট অফিসে যা।

কেন মা?

তুই নিবারণকে হাজার খানেক টাকা টি. এম. ও. করে পাঠিয়ে দে।

মা একটু থেমে বললেন, শ্রাদ্ধশান্তির খরচ তো কম না। তাছাড়া আমি জানি, ওর হাতে বিশেষ কিছুই নেই।

তুমি এক কাপ চা দাও। আমি চা খেয়েই যাচ্ছি।

সব কাজকর্ম মিটিয়ে নিবারণকাকা ফিরে আসার কয়েক দিন পর মা ওকে বললেন, নিবারণ, মা যখন চলেই গেলেন, তখন বউ আর মেয়েকে গ্রামে ফেলে রেখো না। ওদের এখানেই নিয়ে এসো।

মা একটু থেমে বললেন, আমাদের এখানে তো ঘরের অভাব নেই। ওরা দু'জনে এলে কোনো অসুবিধে হবে না।

বৌঠান, ওদের আনতে চাই না শুধু একটা কারণে।

আমি জিজ্ঞেস করি, কী কারণ নিবারণকাকা?

ওদের এখানে আনার সঙ্গে সঙ্গে বাপ-ঠাকুদার ভিটেটা হারাবো।

নিবারণকাকা একটু থেমে বলে, এখন গ্রাম তো আর সেই আগেকার মত নেই। এখন শহরের চাইতে গ্রামে লড়াই-ঝগড়া খেয়োখেয়ি হাজার গুণ বেশি।

ও আবার একটু থেমে বলে, ওরা ওখানেই থাক। এবার থেকে আমি বরং প্রত্যেক মাসেই দু'চারদিন করে ওখানে কাটিয়ে আসবো।

এদিকে আমার জীবনেও এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। নমিতা ও শৈবালদের ছ'জন কলেজের ছাত্রছাত্রীকেও পড়াতে শুরু করলাম। তবে সব বিষয় নয়; শুধু ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস আর পলিটিক্যাল সায়েন্স। সপ্তাহের তিন দিন সন্ধের পর এদের পড়াই। অন্য তিন দিন সন্ধের পর ছাড়াও সপ্তাহের ছ'দিন সকালেই

নাইন-টেন আর ইলেভেন-টুয়েলভ'এর ছেলেমেয়েদের পড়াই। আয় অনেক বেড়ে গেল ঠিকই কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হতো। তাছাড়া কলেজের ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য আমাকেও প্রত্যেক দিন পড়াশুনা করতে হতো। তা হোক। তবু এইসব ছেলেমেয়ের সান্নিধ্যে দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটে যায়।

সেদিন রবিবার।

সাত সকালে সামান্য কিছু মুখে দিয়েই আমি যথারীতি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরুতেই পবিত্র'র সঙ্গে দেখা।

আমাকে দেখেই ও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে, জানিস মানিক, দারুণ খবর আছে।

কী খবর?

সাত্তার সার্জারীতে গোল্ড মেডেল পেয়ে এম.বি.বি.এস. পাস করেছে।

তোকে কে বলল?

ওর ছোট ভাই একটু আগে এসে খবর দিল।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলল, সাত্তার কাল অনেক রাত্তিরে এসেছে। চল, শেখরকে ডেকে নিয়ে ওর ওখানে যাই।

চল।

হাঁটতে হাঁটতেই আমি বললাম, তাহলে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একজন ভাল ডাক্তারও হল।

হ্যাঁ।

একটু থেমে পবিত্র হাসতে হাসতে বলে, এবার পেট কাটতে হলেও একটা পয়সা লাগবে না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ওকে দিয়ে শুধু পেট কাটাবো কেন? এবার থেকে মাথা ধরলেও সাত্তারকে আসতে হবে।

সাত্তারের বাড়ি পৌঁছে দেখি আমাদের আরো ক'জন বন্ধু ইতিমধ্যেই এসে গেছে। তারপর সে কি আনন্দ আর হৈ-হুল্লোড়! সঙ্গে সঙ্গে গবাগব মিষ্টি খাওয়া।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় দুটো বেজে গেল।

আমাকে দেখেই মা হাসতে হাসতে বললেন, সাত্তারের বাড়ি খুব হৈ-হুল্লোড় করে এলি?

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি কী করে জানলে?

নমিতা বলল, তোরা বন্ধুবান্ধবরা মিলে ও বাড়িতে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার লাগিয়ে দিয়েছিস।

ও আমাদের দেখল কখন?

সাত্তারের খবর শুনে ডাক্তারবাবু মেয়ের হাত দিয়েই মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন। ঐ মিষ্টি দিতে গিয়েই . . .

একটু হেসে বললাম, তা হতে পারে। কতজনের পাঠানো কত রকমের মিষ্টি যে খেলাম, তার ঠিকঠিকানা নেই।

যা; চটপট চান করে আয়।

কোনও কথা না বলে আমি আমার ঘরে এসে পা রাখতেই অবাক হয়ে যাই। একবার চারদিকে চোখ বুলিয়েই আমি আবার মার কাছে যাই।

মা, আমার বিছানার নতুন বেড কভার, টেবিলের উপর সুন্দর একটা . .

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মা একুট হেসে বললেন, বেড কভারটা আমিই নমিতাকে দিয়ে কিনিয়েছি; আর টেবিল ক্লথ ও নিজে বানিয়েছে।

ও আবার আমার জন্য টেবিল ক্লথ বানাতে গেল কেন?

কেন আবার?

মা একটু থেমে বললেন, টেবিল ক্লথ পাতার পর তোর টেবিলটা কত ভাল দেখাচ্ছে বল তো!

তা দেখাচ্ছে কিন্তু এসব পাগলামী করার কী দরকার?

এতে পাগলামীর কী আছে? ও তোকে কত শ্রদ্ধা করে, তা জানিস?

আমি একটু থেমে বলি, আমার অন্য ছাত্রছাত্রীরা কী আমাকে শ্রদ্ধা করে না?

করবে না কেন?

মা একটু থেমে বললেন, তবে নমিতা তোর ব্যাপারে যত চিন্তাভাবনা করে, তা বোধহয় অন্য কেউ করে না।

আমি কোনও কথা না বলে চলে যাই কিন্তু মনে মনে ভাবি, এইসব কী নিছক শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা? নাকি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার লক্ষণ?

যাই হোক মনে মনে ঠিক করি, একটু সতর্ক থাকতে হবে। শুধু নমিতা কেন, অন্য কোনো ছাত্রীর সঙ্গেও যেন আমার নাম কোনও কারণেই জড়িয়ে না পড়ে।

তিন

বিধির বিধান কে খণ্ডাবে!

নিবারণকাকা প্রত্যেক মাসেই চণ্ডীতলায় যায়। কখনও তিন-চারদিন থাকে; কখনও আবার দু'একদিন বেশি। কিন্তু সপ্তাহ খানেকের বেশি কখনই নয়। তবে বর্ষার শুরুতে বাড়ি গেলে দু'সপ্তাহের আগে কিছুতেই ফিরতে পারে না।

নিবারণকাকা বলে, বুঝলে মানিক, যা জমি আছে, তার ধান দিয়ে বড় জোর তিন মাস চলে কিন্তু নিজে দেখাশুনা না করলে ওর অর্ধেক ধানও ঘরে আসে না।

এবার বর্ষা শুরু হয়েছে বেশ দেরিতে। সারা বোশেখ মাসের মধ্যে একদিনের জন্য বৃষ্টিও হয়নি, কালবৈশাখীও হয়নি। জ্যৈষ্ঠ মাসেও অবস্থা তথৈবচ ছিল। সারা মাসের মধ্যে মাত্র দু'তিন দিন বৃষ্টি হয়েছে। জমি ভিজতে-না-ভিজতেই আবার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে কিন্তু আষাঢ়ের প্রথম দিন থেকেই শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি।

দু'তিন দিন পর পর বৃষ্টি হতেই নিবারণকাকা মা'কে বলল, বৌঠান, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে কালই বাড়ি যাই। বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, একটু দেরি হলেও চাষ-আবাদ খারাপ হবে না।

মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও।

আমি একটু হেসে বললাম, নিবারণকাকা, আসার সময় তোমার গাছের কামরাঙা আনতে ভুলে যেও না।

একটু থেমে বলি, অত ভাল কামরাঙা এখানে পাওয়াই যায় না।

ও একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আনবো।

পরের দিন সাত সকালেই নিবারণকাকা চণ্ডীতলা রওনা হল।

এক সপ্তাহ ঘুরতে-না-ঘুরতেই নিবারণকাকা ওর মেয়ে চাঁপাকে নিয়ে ফিরে এসেই কাঁদতে কাঁদতে বলল, বৌঠান, চাঁপার মা চলে গেল!

মা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, চলে গেল মানে? হঠাৎ কী হল?

বৌঠান, ওর চিৎকার শুনেই আমি লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে আসতেই দেখি, পাঁচ-ছ' ফুট লম্বা কেউটে সাপটা উঠোন ছেড়ে . . .

ঐ সাপটাই কী . . .

হ্যাঁ, বৌঠান, ঐ সাপটাই চাঁপার মাকে শেষ করে দিল।

হাসপাতালে নিয়ে যাওনি?

হ্যাঁ, বৌঠান, গিয়েছিলাম।

নিবারণকাকা একটু থেমে বলে, আমাদের পাড়ার খগেনের টেম্পো করে সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে নিয়ে যাই। ডাক্তারবাবু ইনজেকশনও দিলেন কিন্তু তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নিবারণকাকা বলল, শেষ পর্যন্ত পাশের বাড়ির বসন্তদের উপর বাড়িঘর-জমিজমার সব ভার দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে চলে এলাম।

মা বললেন, ভালই করেছ।

বছর পাঁচেক আগে আমি নিবারণকাকার সঙ্গে একবার চং গিয়েছিলাম। তখন চাঁপা পাঁচ-ছ' বছরের। এই পাঁচ বছরের মধ্যে ও যে এত বড় হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। যারা জানে না, তারা ওকে দেখলে মনে করবে, তের-চোদ্দ বছরের হবে। অবশ্য নিবারণকাকার যা লম্বা-চওড়া চেহারা! ওর মেয়েও যে এই ধরনের হবে সেটাই স্বাভাবিক।

মা চাঁপাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বললেন, আহা, কি সুন্দর চোখ-মুখ! দেখলেই আদর করতে, ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাই নারে মানিক?

আমি একটু হেসে বললাম, হ্যাঁ।

যাই হোক সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দেখলাম, চাঁপা মা'র দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁরে চাঁপা, আলমারির চাবিটা কোথায় রাখলাম, বলতে পারিস?

চাঁপা একটু হেসে বলে, আমি বাবাকে বাজারের টাকা বের করে দেবার পর তোমার আঁচলেই বেঁধে রেখেছি।

ও তাইতো।

বড়মা, তুমি বড্ড ভুলে যাও তো!

ও একটু থেমে একটু হেসে বলে, আমি না বললে কাল তো তুমি মাছের ঝোলে দু'বার লবণ দিতে।

মা একটু হেসে বলেন, ঠিক বলেছিস। সত্যি, আজকাল মাঝে মাঝে বড্ড ভুলে যাই।

সেদিন সকালবেলায় ছাত্রীরা চলে যাবার পর রান্নাঘরের বারান্দায় বসে যথারীতি আমি, মা আর নিবারণকাকা চা খেতে খেতে গল্পগুজব করছি। হঠাৎ চাঁপা বলল, বড়মা, তুমি আর বেশিক্ষণ গল্পগুজব না করে এবার চান করতে যাও।

মা বললেন, এখনই চান করতে যাবো কেন?

তোমাকে তো বারোটার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে।

সবাইকে ফেলে আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব?

হ্যাঁ, বড়মা, আজ তোমাকে তাড়াতাড়িই খেতে হবে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আজ দুটোর সময় ডাক্তারদা তোমার রক্ত নিতে আসবেন না?

মা ডান হাতের তালু কপালে দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছিস তো চাঁপা। আজ যে সাত্তার আমার রক্ত নিতে আসবে, তা একদম মনে ছিল না।

আমি বললাম, আজ যে সাত্তার আসবে, তা তো আমি জানি না।

চাঁপা একটু হেসে বলে, এই ক'দিনের মধ্যেই আমি বেশ বুঝে গেছি, তুমি সংসারের কত খোঁজখবর রাখো।

মা একটু হেসে বললেন, ঠিক বলেছিস চাঁপা।

একদিন আমি বাথরুম থেকে বেরুতেই মা কাপড়-চোপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছেন। ঠিক সেই সময় চাঁপা দৌড়ে এসে চিলের মত ছোঁ মেরে মা'র হাত থেকে শাড়িটা কেড়ে নিয়েই বলল, তুমি আবার ঐ কাপড়টা নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছো?

মা একটু হেসে বললেন, এই শাড়িটা যে বড্ড বিচ্ছিরিভাবে ছিঁড়ে গেছে, তা আমার খেয়ালই ছিল না।

চাঁপা দৌড়ে আলনা থেকে অন্য একটা শাড়ি এনে মা'র হাতে দিয়ে বলে, এবার থেকে আমাকে না বলে কোনও জামাকাপড়ে হাত দেবে না।

নিবারণকাকা স্টোভ পরিষ্কার করতে করতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, এই চাঁপা! এইভাবে বড়মা'র সঙ্গে কথা বলে?

আচ্ছা বড়মা, আমি কী তোমাকে খারাপ কিছু বলেছি?

মা ডান হাত দিয়ে চাঁপার গাল টিপে আদর করে বললেন, ওরে পাগলি, তোর এইসব শাসন করা যে আমার কত ভাল লাগে, তা তো তোর বাবা জানে না।

মাস খানেক পরের কথা। নিবারণকাকা মাসকাবারী জিনিসপত্র কিনতে গেছে। চাঁপা বাথরুমে কাপড়-চোপড় কাচতে ব্যস্ত। আমি আর মা রান্নাঘরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি।

হঠাৎ কথায় কথায় মা বললেন. জানিস মানিক, চাঁপাকে আমি যত দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।

কেন?

মেয়েটা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই সংসারী।

আমি একটু হেসে বলি, তাই নাকি?

হ্যাঁরে।

মা একটু থেমে বলেন, ও এসে যে আমার কি উপকার হয়েছে, তা তোকে বলে বোঝাতে পারবো না।

আচ্ছা!

হ্যাঁরে, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

মা আবার একটু থেমে বলেন, নিবারণের বউ মেয়েটাকে সত্যি ভাল শিক্ষা দিয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মা বলেন, আমি ঠিক করেছি, রোজ ঘণ্টা খানেক ওকে পড়াবো।

ও কোন ক্লাসে পড়ছিল?

ও ক্লাস ফোর'এ উঠেই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কেন?

ওদের গ্রামের স্কুলের মাস্টার মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ঐ স্কুলও উঠে যায়।

কাছাকাছি কী আর কোনও স্কুল ছিল না?

শুনলাম, অন্য স্কুলটা মাইল পাঁচেক দূরে। তাছাড়া গঙ্গা পার হয়ে যেতে হতো বলে ওর মা যেতে দেয়নি।

মা একটু থেমে বলেন, যাই হোক তুই ওর জন্য কয়েকটা বই এনে দিবি তো।

ওর ঠিক কি বই লাগবে, তা কী আমি বুঝবো?

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, তার চাইতে তুমিই বরং চাঁপাকে সঙ্গে নিয়ে চঞ্চলদার দোকান থেকে পছন্দমত বইপত্তর নিয়ে এসো।

হ্যাঁ, সেই ভাল।

এইভাবে চলতে চলতে মাস ছয়েক পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার বললাম,

মা সংসারের সব দায়-দায়িত্ব চাঁপার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

মা'কে জিজ্ঞেস করলাম, চাঁপা কী সব সামলাতে পারবে?

আমার আর টাকাকাড়ির হিসেব-নিকেশ রাখতে ভাল লাগে না। তাছাড়া কখন কোথায় কি রাখি, তাও খেয়াল থাকে না।

মা একটু হেসে বললেন, আমার মনে হয়, ও আমার চাইতে ভালই সংসার চালাবে।

আমি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম, তাই কখনো হতে পারে? তোমার বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে কী চাঁপার . . .

আমার কথার মাঝখানেই মা বললেন, আরো দু'চার মাস যাক। তারপর তোর কথার জবাব দেব।

মা'র সঙ্গে আমি কোনও কালেই কোনও বিষয়েই তর্ক করি না। তাছাড়া সংসার-ধর্মের ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা আগ্রহ নেই। আমি দু'চারটে জামাকাপড় আর দু'বেলা খেতে পেলেই মহাখুশি। তার ব্যবস্থা মা যখন করছেন, তখন আমি আবার কেন এইসব নিয়ে মাথা ঘামাই?

তবে ইদানীং কালে চাঁপার কাণ্ড-কারখানা দেখে মজাও লাগে, অবাকও হই।

সন্ধেবেলায় কলেজের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসবে বলে তৈরি হচ্ছি। ঠিক সেই সময় চাঁপা আমার ঘরে ঢুকেই বলল, আচ্ছা মানিকদা, তুমি কী বল তো?

কেন? কী হয়েছে?

সেই সাত সকাল থেকে একই পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে থাকতে তোমার ঘেন্না করে না? নাকি তোমার জামাকাপড় নেই?

ও প্রায় না থেমেই বলে যায়, তোমার বিছানার উপরেই পায়জামা-পাঞ্জাবি রেখে গেছি, তাও তোমার চোখে পড়েনি?

বিছানার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললাম, এখন ধোপাবাড়ির কাচানো পায়জামা-পাঞ্জাবি পরবো কেন?

ওগুলো ধোপাবাড়ির কাচানো না।

তবে?

ওগুলো বাড়িতেই . . .

ইস্ত্রি করল কে?

বাবা।

মুহূর্তের জন্য একটু থেমে একটু হেসে চাঁপা বলল তবে কয়েক দিনের মধ্যে আমিও ইস্ত্রি করা শিখে যাবো।

ও বারান্দার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, পায়জামা-পাঞ্জাবি বদলে নাও। আমি বড়মা'র চুল বাঁধতে বাঁধতে চলে এসেছি।

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চাঁপা প্রায় লাফ দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে মা'র ঘরের দিকে চলে গেল।

রাত্রে খেতে বসে নিবারণকাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, কার কাছ থেকে ইস্ত্রি এনে আমার পায়জামা-পাঞ্জাবি . . .

কারুর কাছ থেকেই ইস্ত্রি আনিনি। ইস্ত্রি কেনা হয়েছে।

হঠাৎ ইস্ত্রি কিনলে কেন?

নিবারণকাকা একটু হেসে বলল, ক'দিন আগে বৌঠানের খবর জানাতে চাঁপাকে নিয়ে সাত্তারের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর ভাইকে ইস্ত্রি করতে দেখে চাঁপার মাথায় চাপল . . .

বুঝেছি।

মা বললেন, ইস্ত্রি কিনে ভালই হয়েছে।

খেতে খেতেই এইসব কথাবার্তা হয়। আমি আর নিবারণকাকা মাঝের ঝোল দিয়ে খেতে শুরু করার দু'চার মিনিট পরই মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, মাছের ঝোল কেমন হয়েছে?

খুব ভাল।

একটু থেমে বলি, তবে আজ একটু অন্যভাবে রেঁধেছ, তাই না?

মা একটু হেসে বললেন, আমি না, আজ চাঁপাই মাছের ঝোল রেঁধেছে।

চাঁপা দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, খেয়ে উঠে তোর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করবো।

এইভাবে সেবা, যত্ন আর আন্তরিকতা দিয়ে চাঁপা ধীরে ধীরে মা আর আমাকে জয় করে।

বছর খানেক ঘুরতে-না-ঘুরতে দেখা গেল, প্রতিটি ব্যাপারে চাঁপার সাহায্য ছাড়া আমি বা মা কিচ্ছু করতে পারি না।

চাঁপাকে নিয়ে রিক্সায় উঠতে গিয়ে মা থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, হ্যাঁরে, সাত্তারকে দেখিয়ে একেবারে ওষুধ কিনে ফিরব। সঙ্গে টাকা নিয়েছিস তো?

হ্যাঁ।

সাত্তার কি কি ওষুধ খেতে বলবে, তা তো ঠিক নেই। একটু বেশি টাকা সঙ্গে নিয়েছিস তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার কোনও চিন্তা নেই।

চাঁপা একটু হেসে বলে, টাকা না দিলেও প্রশান্তদার বাবা ঠিকই ওষুধ দিয়ে দেবেন।

ইদানিং কালে নানা কারণে আমাকে ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে হয়। চাঁপা কখনই আমাকে খালি হাতে যেতে দেয় না। বলে, মানিকদা, এই পঁচিশ টাকা দিয়ে ভারত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে মিষ্টি কিনে তোমার ছাত্রের দিদি-বৌদির হাতে দিও।

আজ তো ওদের বাড়িতে কোনও উৎসব নেই। নেহাৎ খেতে বলেছে বলেই . . .

তা হোক; একেবারে খালি হাতে যাওয়া ভাল দেখায় না।

মা বললেন, চাঁপা ঠিকই বলেছে। যে কারণেই হোক, নেমন্তন্ন যখন করেছে, তখন খালি হাতে যাওয়া সত্যি ভাল দেখায় না।

দু'এক মাস পর পরই কোনও-না-কোনও ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশনে আমার নেমন্তন্ন হয়। এইসব সামাজিক অনুষ্ঠানের নিয়ম-কানুন রীতি-নীতি সম্পর্কে আমি বিশেষ অভিজ্ঞ না। মা'কে জিজ্ঞেস করলে বলেন, আগে তো অন্নপ্রাশনে থালা-গেলাস-বাটি দিতো কিন্তু সবাই যদি ঐ একই জিনিস দেয়, তাহলে বাচ্চাটারও কোনও উপকার হয় না, বাপ-মায়েরও কোনও কাজে লাগে না।

তাহলে সুশীলের ভাইপোকে কী দেব?

মা উত্তর দেবার আগেই চাঁপা বলল, বাচ্চাদের খেলনা দেওয়াই সবচাইতে ভাল কিন্তু এখানে কী ভাল খেলনা পাওয়া যাবে?

মা বললেন, তা ঠিক; খেলনা পেলেই বাচ্চারা সবচাইতে খুশি হয়।

নিবারণকাকা বলল, এখানে তো সব স্টেশনারী দোকানে খেলনা পাওয়া যায়।

চাঁপা সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, মানিকদা তো ঐ দশ-বিশ টাকা দামের প্ল্যাস্টিকের খেলনা দিতে পারে না। দিতে হলে একটু ভাল খেলনাই দিতে হয়।

আমি বললাম, হ্যাঁ; একেবারে আলতু-ফালতু কিছু দেওয়া যায় না।

হঠাৎ চাঁপা বলল, মানিকদা, একটা কাজ করো।

কী?

তোমার বন্ধু পবিত্রদা তো রোজ কলকাতায় যান। ওঁকে দিয়ে কলকাতা থেকে একটা ভাল খেলনা কিনে আনার ব্যবস্থা করো।

ও একটু থেমে বলল, অন্নপ্রাশন তো সামনের সোমবার। এর মধ্যে উনি

ঠিকই এনে দিতে পারবেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, চাঁপা, এবার থেকে শুধু মা'র প্রাইভেট সেক্রেটারী না, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজও তোকে করতে হবে।

চাঁপা মুখ টিপে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, কত মাইনে দেবে?

তোর বড়মা তোকে কত মাইনে দেন?

তা বলব কেন? তুমি কত দেবে, তাই বল।

পাঁচ টাকা।

না, না, অত বেশি মাইনের চাকরি আমরা দ্বারা হবে না।

ওর কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠি।

হঠাৎ একদিন মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে মানিক, শ্রীমন্ত সরকারের যে ছেলে তোর সঙ্গে পড়তো, সে কী করে রে?

শ্রীমন্তকাকার এত প্রেসার যে উনি আর দোকানে আসতেই পারেন না। এখন সুধীরই তো দোকান চালায়।

সুধীরই তোর সঙ্গে পড়তো?

হ্যাঁ।

ওর সঙ্গে তোর দেখা হয়?

প্রত্যেক রবিবার সকালেই দেখা হয়।

ওকে আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে বলিস তো।

হ্যাঁ, বলব।

তারপর সুধীর কবে মা'র সঙ্গে দেখা করেছে বা কি কথাবার্তা হয়েছে, তা আমি জিজ্ঞাসাও করিনি, মা'ও কিছু বলেননি। আসলে সারাদিন আমি ছাত্রছাত্রী আর নিজের পড়াশুনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে অন্য কোনো ব্যাপারেই আমি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারি না। দরকারও হয় না।

সেদিন রাত ন'টা নাগাদ ছেলেমেয়েরা চলে যাবার পর পরই চাঁপা বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেই কোনোকিছু না বলেই আমাকে প্রণাম করল। জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ প্রণাম করলি কেন? আজ কী তোর জন্মদিন?

ও উত্তর দেবার আগেই মা দরজার কাছে এসে একটু হেসে বললেন, হ্যাঁরে চাঁপা, দাদাকে জিজ্ঞেস কর, কেমন দেখাচ্ছে?

এবার চাঁপা এক গাল হাসি হেসে দু'কানে হাত দিয়ে বলল, এই দ্যাখো, বড়মা আমাকে কি দিয়েছেন।

ওর দুই কানে দু'টো ছোট্ট সোনার গহনা দেখেই একটু হেসে মা'কে বললাম,

এইজন্যই বুঝি তুমি সুধীরকে ডেকে পাঠিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

মা একটু থেমে বললেন, আমার একটা ভাঙা আংটি পড়েছিল। তাই দিয়ে এই দুটো তৈরি করালাম।

আমি কী বলব? চুপ করে আছি।

মা আবার বললেন, মেয়েটার হাত, গলা, কান—সব খালি ছিল বলে বড্ড খারাপ লাগতো। তাই . . .

চাঁপা খুশির হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না?

দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে।

দেখেছ তো, বড়মা আমাকে কত ভালবাসে।

রাত্রে খেতে বসে নিবারণকাকা বলল, বৌঠান, মেয়েটার জন্য এতগুলো টাকা খরচ করে সোনার জিনিস তৈরি না করলেই ভাল করতেন।

মা বললেন, দেখ নিবারণ, খুব ভাল করেই জানো, আমার স্বামী কোনোদিন আমাকে এক টুকরো সোনাও দেননি। আমার বাবাও আমাকে অতি সামান্য সোনা দিয়েছিলেন।

উনি একটু থেমে বলেন, যেবার আমার অপারেশন হয়, সেবার সুধীরের বাবার কাছে কি বিক্রি করা হয়েছিল, তাও তুমি জানো।

নিবারণকাকা বলল, জানব না কেন? সবই জানি।

মা বলেন, আমার কাছে শুধু শাশুড়ীর দেওয়া হার ছাড়া অতি সামান্য কিছু সোনাদানা পড়ে আছে। তার থেকে সামান্য কিছু চাঁপাকে দিয়ে যদি আমি খুশি হই, তাহলে তো কারুর কিছু বলার নেই।

না, তা না, কিন্তু . . .

নিবারণকাকাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি একটু হেসে বললাম, মা তো এই বাড়িটা চাঁপার নামে লিখে দেননি! এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে অযথা চিন্তা করো না।

এইভাবেই দিনগুলো বেশ আনন্দের মধ্যেই কেটে যায়।

তবে হ্যাঁ, এরই মধ্যে মা আমার বিয়ে দেবার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

দ্যাখ মানিক, আমার শরীর যে বিশেষ ভাল না, তা তুই খুব ভাল করেই জানিস। . . .

জানি বৈকি।

চাঁপা না থাকলে আমি যে কি করে সংসার চালাতাম, তা ভগবানই জানেন। তাই ভাবছিলাম, এবার তোর জন্য মেয়ে-টেয়ে দেখা শুরু করবো।

মা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, আমি যদি দুম করে চলে যাই, তাহলে তোকে কে দেখবে?

মা, তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, বিয়ে করে সংসারধর্ম করতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

একটু থেমে বলি, এখনকার মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে এসে কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আশা করে। তাছাড়া আজকালকার দিনে বাচ্চাদের ঠিকমত লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা খুব সহজ না।

এসব কী আমি জানি না?

নিশ্চয়ই জানো কিন্তু আমার মত প্রাইভেট টিউটরের পক্ষে এই দায়-দায়িত্ব পালন করা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে।

তুই কী কম আয় করিস?

মা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তাছাড়া তুই-ই তো আমাকে বলেছিস স্কুল কমিটির দু'দিনজন মেম্বার তোকে স্কুলে নিতে খুবই আগ্রহী। স্কুলে চাকরি নিলে তো অনিশ্চিত আয় থাকবে না।

আমি একবার নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, যেখানে অন্য সবাই চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে চাকরি পাচ্ছে, সেখানে আমি যদি টাকা না দিয়ে চাকরি পাই, তাহলে সহকর্মীদের শত্রুতা বা ঈর্ষার জন্য আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

একটু হেসে বললাম, বেশ মহাসুখে আছি। বিয়ে-থা করে ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে আমার কোনও ইচ্ছে নেই।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুই রাজি না হলে আমি নিশ্চয়ই জোর করে বিয়ে দেব না বা তা সম্ভবও না। তবে আমার মনে হয়, তুই বিয়ে করলে ভাল হতো।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, মা, তুমি তো জানো না, আজকালকার বহু মেয়েই শুধু স্বামী ছাড়া আর কাউকে সহ্য করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমার বউ যে তোমাকে এই বাড়ি থেকে বের করে দেবে না, তার কী কোনও ঠিকঠিকানা আছে?

সে ধরনের মেয়ের সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দিতাম না।

তুমি আগে থেকে কি করে জানবে, কোন মেয়ের মনে কী আছে?

আমি জানাশুনা ভাল মেয়ের সঙ্গেই তোর বিয়ে দিতাম।

আমি অবাক হয়ে বলি, জানাশুনা ভাল মেয়ে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানাশুনা ভাল মেয়ে।

মা প্রায় না থেমেই বলেন, আমাদের এই কাটোয়া শহরেই কী ভাল মেয়ে কম আছে?

কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু চিন্তা করেই আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, মা, যদি আমার কোনো ছাত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার কথা ভেবে থাকো, তাহলে ঠিক করোনি। গল্প-উপন্যাসের মাস্টার মশাইরা ছাত্রীদের বিয়ে করেন কিন্তু আমার দ্বারা কোনোদিন তা সম্ভব হবে না।

ব্যস! আর এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে আমি মা'র ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মা'কে এইসব কথা বলে আমারই খারাপ লাগলো কিন্তু না বলেও পারলাম ন। কারণ এই ক' বছর ধরেই আমার প্রতি নমিতার দুর্বলতার ইঙ্গিত আমি বার বার পেয়েছি। তাছাড়া ও বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগে থেকেই ওর মা প্রায়ই কিছু খাবার-দাবার এটা-ওটা আমাকে দিয়ে যেতেন। আমি বার বার বারণ করা সত্ত্বেও উনি শুধু বার বার আমাকে বলতেন, মানিক, আমি তো তোমার মায়ের মত। তোমাকে কিছু দিলে যদি আমি শান্তি পাই, তাহলে তো তোমার আপত্তি করা উচিত না বাবা।

সর্বোপরি আরো একটা ব্যাপার আছে।

দিন পনের আগে সাত্তার আমাকে বলল, তোকে খুব প্রাইভেটলি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তুই খোলাখুলি উত্তর দিবি।

আমি একটু হেসে বললাম, তোকে কোন কথা খোলাখুলি বলি না?

যাই হোক, আসল কথা শোন।

হ্যাঁ, বল।

হরেন ডাক্তারের মেয়ে নমিতাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তোর কোনও আপত্তি আছে কী?

হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

হরেন ডাক্তার আমাকে এসে ধরেছিলেন, তোকে এই বিয়ের ব্যাপারে রাজি করাবার জন্য।

তুই কী বললি?

চিন্তা-ভাবনা না করে আমি চট করে বিয়ে-থা'র ব্যাপারে জড়াতে চাই না।

ঠিক করেছিস।

আমি সাত্তারকে নমিতার হাবভাব চাল-চলন ও ওর মা'র সব ব্যাপার পর পর বললাম, তুই জানিস, আমি কেন স্কুলে চাকরি নিলাম না?

হ্যা, জানি বৈকি।

সাত্তার একটু থেমে বলল, তুই চাকরি না নিয়ে ঠিকই করেছিস। তুই চাকরি নিলে তোর সহকর্মীরাই তোকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করতো।

প্রথমত ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে এখন ভাল আয় করছি বলেই যে চিরকাল ভাল আয় করবো, তার কোনো স্থিরতা নেই। . . .

সে তো একশ'বার সত্যি।

এই অনিশ্চিত আয়ের উপর ভিত্তি করে আমি বিয়ে করলে ভবিষ্যতে যে বিপদে পড়ব না, তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ও মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায়।

আমি বলে যাই, বিয়ে-থা করে সংসারী হবার বাসনা আমার নেই। তার চাইতেও বড় কথা, আমি আমার ছাত্রীকে বিয়ে করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

সাত্তার একটু হেসে বলল, আমি জানতাম, তুই কিছুতেই নমিতাকে বিয়ে করতে রাজি হবি না।

এই প্রসঙ্গ শেষ হবার পর টুকটাক গল্পগুজব করতে করতেই সাত্তার বলল, দ্যাখ মানিক, কাকিমার প্রেসার একবার বাড়ছে, একবার কমছে, কিন্তু কিছুতেই স্টেবিলাইজ করছে না।

প্রেসার ওঠা-নামা তো ভাল না, তাই নারে?

না, ভাল না; তবে যে রকম ওঠা-নামা বিপদের কারণ হয়, কাকিমার সেরকম কিছু না।

ও একটু থেমে বলে, তুই চাঁপাকে বলবি, ও যেন কাকিমাকে ঠিকমত ওষুধ খাওয়ায়। তাছাড়া উনি যেন ঠিকমত ঘুমোন।

হ্যাঁ, বলব।

বিপদ যে কখন কোন দিক থেকে আসবে, তা কেউ বলতে পারে না। যা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি, তাই ঘটল।

সেদিন রবিবার।

বিকেলবেলায় আমি, মা আর নিবারণকাকা চা খেতে খেতে জমিয়ে গল্পগুজব করছিলাম। চাঁপা পাশে বসে অবাক হয়ে আমাদের কথা শুনছিল। হঠাৎ কি একটা কথা বলতে গিয়েই নিবারণকাকা ঢলে পড়ল।

আমরা তিনজনেই চিৎকার করে উঠলাম। সেই চিৎকার শুনে পাশের বাড়ির অখিল ছুটে আসতেই বললাম, দৌড়ে সাত্তারকে ডেকে আন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাত্তার এলো। ই-সি-জি করেই পর পর তিনটে ইনজেকশন দিয়ে এক দৃষ্টিতে নিবারণকাকার মুখের দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকার পর আবার ই-সি-জি করল। দশ-পনের মিনিট পর আবার একটা ইনজেকশন দিল। আবার ই-সি-জি দেখতে দেখতেই হঠাৎ আপনমনে বলল, মাই গড !

কী হল সাত্তার?

সাত্তার দু'হাত দিয়ে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মানিক, নিবারণকাকা চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই চাঁপা পাগলের মত চিৎকার করে উঠল, বাবা!

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন মা।

চাঁপা অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে মা'কে জড়িয়ে ধরে বলল, বড়মা, মা চলে গেল, বাবা চলে গেল, আমি কী করে বাঁচব?

মা কাঁদতে কাঁদতেই ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, ওরে, আমি তো আছি, তোর মানিকদা আছে। আমরা কী তোর কেউ না?

আমি ওদের মত চিৎকার করলাম না কিন্তু চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিলাম। আমি সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করলাম, নিবারণকাকা আমার বুকের কতখানি জুড়ে ছিলেন।

বাবাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা, সততা, সংস্কার-মুক্ত মন ও সর্বোপরি শান্ত সমাহিত ভাব দেখে মনে হতো, বাবা যেন তুষারমৌলী হিমালয় শৃঙ্গ। বাবা আমার আদর্শ, আমার জীবনদেবতা। চিরকাল স্বপ্ন দেখেছি, বাবার আদর্শকে জীবনের ধ্রুবতারা করে বেঁচে থাকার। কিন্তু বাবাকে কখনই খুব কাছের মানুষ মনে করতে পারিনি। জীবনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁকে পাশে পাবার কথা কখনই ভাবিনি। তাইতো বাবার মৃত্যুতে এক বিচিত্র মানসিক শূন্যতা অনুভব করেছিলাম।

আর নিবারণকাকা?

নিবারণকাকা আমাকে সন্তানস্নেহে লালন-পালন করেছে, দৈনন্দিন জীবনের ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে শিখিয়েছে। ভাই ও বন্ধুর মত সে আমার নিত্য সহচর ছিল। আমার সামান্যতম দুঃখেও সে চোখের জল ফেলত; আবার সামান্য খুশিতে সে আনন্দে আত্মহারা হত। এই পৃথিবীতে যে আমার সবচাইতে কাছের মানুষ ছিল, যার উপর আমি সবচাইতে নির্ভরশীল ছিলাম, সেই

নিবারণকাকার মৃত্যুতে নিজেকে বড় অসহায়, নিঃসঙ্গ মনে হল।

নিবারণকাকার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বন্ধু-বান্ধব, ছাত্রছাত্রী ও প্রতিবেশীরা ছুটে এলেন। সবার মুখেই এক কথা, আহা, এমন মানুষ আর হবে না। বন্ধুবান্ধবরা তো চোখের জল না ফেলে পারল না। পবিত্র বলল, সাত্তার, তোর মনে আছে, নিবারণকাকাই আমাদের প্রথম নৌকায় চড়িয়ে গঙ্গার ওপারে নিয়ে গিয়েছিলেন।

খুব মনে আছে।

সাত্তার একটু থেমে বলল, আমাদের বাবা-কাকারা তো বিশেষ কোথাও নিয়ে যেতেন না। নিবারণকাকার সঙ্গেই আমরা প্রথম গঙ্গার ওপারে গেছি, রাত জেগে যাত্রা দেখেছি, কালনা-গুপ্তীপাড়া বেড়াতে গেছি।

সুধীর বলল, নিবারণকাকা নিয়ে যেতেন বলেই বাবা-মা'র কাছ থেকে পারমিশন পাওয়া যেতো।

পবিত্র বলল, আমাদের একটু আনন্দ দেবার জন্য উনি কত ঝক্কি-ঝামেলা সামলাতেন কিন্তু কোনদিন বিরক্ত হতেন না।

সাত্তার একটু হেসে বলল, তাছাড়া আমাদের বালক সংঘের হয়ে যে গোল করতে পারতো, তাকেই নিবারণকাকা কাঁধে বসিয়ে . . . .

তিন-চারজন একসঙ্গে বলল, সত্যি, আমরা গোল দিলে নিবারণকাকা আনন্দে কি কাণ্ডই করতেন।

আরো কত কথা, কত স্মৃতি সবাই রোমন্থন করল।

তারপর?

এরপর প্রায় সম্রাটের মত সাজিয়ে-গুছিয়ে পালঙ্কে শুইয়ে আমরা সবাই গঙ্গাপাড়ে নিবারণকাকাকে পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিয়ে এলাম।

চার

নিবারণকাকার অপ্রত্যাশিত চিরবিদায়ের ধাক্কা যেন আমরা কিছুতেই সামলাতে পারি না। এই শূন্যতা মাঝে মাঝেই অসহ্য মনে হয়।

ছোটবেলার কথা না হয় বাদই দিলাম। তখন তো নিবারণকাকার কাঁধে চড়ে, কোলে চড়ে বা হাত ধরে সব জায়গায় যেতাম। কলেজে পড়ার সময়ও প্রায়ই ও কলেজের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিত। দিনের বেলায় সম্ভব না হলেও রাত্তিরে

বরাবর আমরা দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসতাম। আর এখন?

জানো মা, পাশে বসে নিবারণকাকা খাচ্ছে না ভাবলেই আমার আর খেতে ইচ্ছে করে না।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমারও তো ঐ একই অবস্থা। তোদের সংসারে আসার পর থেকেই নিবারণ আর আমি ঠিক যমজ ভাইবোনের মত একসঙ্গে উঠেছি, বসেছি, খেয়েছি।

চাঁপা আমাকে খেতে দিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনে নীরবে চোখের জল ফেলে।

শুধু রাত্রে খেতে বসে না, অন্য অনেক সময়ই আমরা ওর কথা আলোচনা করি।

মা বললেন, নিবারণ মারা যাবার পর বুঝলাম, শুধু আমরা না, আরো কত লোক ওকে ভালবাসতো।

সত্যি মা, আমিও ভাবতে পারিনি, নিবারণকাকা মারা যাবার খবর শুনে এত লোক আমাদের বাড়ি আসবে বা শ্মশানে যাবে।

তোর বন্ধুবান্ধবদের কথা না হয় বাদই দিলাম। ওদের তো নিবারণ নিজের সন্তানের মতই ভালবাসতো কিন্তু অন্য লোকজনদের চোখের জল ফেলতে দেখে সত্যি অবাক লেগেছে।

এই শূন্যতার জ্বালা বাদ দিয়েও নিবারণকাকার অভাবে সংসার চালাতে গিয়ে আমরা পদে পদে সমস্যায় পড়লাম।

মা বললেন, হ্যাঁরে মানিক, কাকে দিয়ে বাজার-হাট করাই বল তো?

উনি একটু থেমে বললেন, একে-ওকে ধরে আর কতদিন চালাবো বল তো! একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে তো বড্ড সমস্যা হচ্ছে।

আমি বললাম, যত দিন কোনও লোকজনের ব্যবস্থা করতে না পারি, ততদিন আমিই বাজার-হাট করবো।

তুই কী জীবনে কোনোদিন বাজার-হাট করেছিস?

আগে করিনি বলে তো এখন বাজার-হাট না করলে চলবে না। প্রথম দু' চারদিন একটু অসুবিধে হলেও আস্তে আস্তে . . .

চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সকাল-সন্ধেয় তোমাকে ছেলেমেয়ে পড়াতে হয়। তুমি কখন বাজার করবে?

ও প্রায় না থেমেই বলে, বড়মা, এবার থেকে আমিই বাজার-হাট করবো।

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, না, আমি তোকে শাক-সবজি-মাছের বাজারে

পাঠাবো না।

মা'র আপত্তির কারণ বুঝতে আমার অসুবিধে হয় না। চাঁপাকে দেখে বয়সের তুলনায় একটু বড় মনে হয়। তাছাড়া এই বছর চারেকে মা'র যত্নে ও দেখতেই শুধু সুন্দর হয়নি, স্বাস্থ্যও ভাল হয়েছে। তাইতো অনেকেই চোদ্দ বছরের চাঁপাকে দেখে আঠারো-উনিশ বছরের ভাবে।

আমি বললাম, বন্ধুবান্ধবদের বলে দু'একদিনের মধ্যেই আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করছি।

পরের রবিবার সকালে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় আমাদের সমস্যার কথা বলতেই সুধীর বলল, এটা আবার কোনও সমস্যা হল? মাসীমাকে বলিস, আমাদের দোকানের কোনও একটা ছেলে সকালে গিয়ে বাজার করে দেবে।

তাতে তোর অসুবিধে হবে না?

বিন্দুমাত্র না।

সুধীর একটু থেমে বলল, নিতান্ত খুলতে হয় বলে রোজ সকালে দোকান খুলি কিন্তু সন্ধের আগে জুয়েলারী শপ্'এ কোনও খদ্দের আসে না বললেই চলে।

আমি একটু হেসে বললাম, যাই হোক দেখিস, ছেলেমেয়েদের বসিয়ে রেখে আমাকে আবার বাজারে ছুটতে না হয়।

পবিত্র বলল, তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? আমরাও তো আছি।

তিন-চারদিন পরের কথা। আমি খেতে বসেই চাঁপাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? এত রকম রান্না করেছিস কেন?

চাঁপা বলল, বড়মা, তুমিই বল, কেন এত রান্না করেছি।

মা একটু হেসে বললেন, সকালে সুধীরের দোকানের ছেলেটাকে দিয়ে বাজার করাবার পর যদি তোর বন্ধুরা এটা-ওটা দিয়ে যায়, তাহলে . . .

কে আবার এটা-ওটা দিয়ে গেল?

সাত্তারকে কোন একটা রুগীর বাড়ি থেকে অনেকগুলো গলদা চিংড়ি দিয়েছিল বলে চারটে মাছ তোর আর চাঁপার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। . . .

এ তো অত্যন্ত সুখের কথা।

আবার রান্নাবান্না হয়ে যাবার পর পবিত্র'র মা এসে ফুলকপির তরকারী আর আমসত্ত্বের চাটনি দিয়ে গেলেন। তাই . . .

আমি একটু হেসে বলি, এবার থেকে কেউ কিছু দিতে এলে বলে দিও, আগের দিন যেন আমাদের জানিয়ে দেয় কে কি দেবে। তাহলে আমরা সেই

মত বাজার-হাট করবো।

চাঁপা বলল, বড়মা কেন বলবেন? তুমিই্ বলে দিও। বড়মা তো তোমার মত কেপ্পন না।

আমি কেপ্পন?

কেপ্পন না হলে ঐ কথা কেউ বলে?

চাঁপা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তুমি যত বেশি আয় করছো, তত বেশি কেপ্পন হচ্ছো।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, তার মানে?

তোমার বন্ধুরা তো হরদম আমাদের কিছু-না-কিছু পাঠিয়েই যাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে তাদের বাড়িতে নেমন্তন্নও খাও কিন্তু কই, এক বেলার জন্যও তো বন্ধুদের ডাল-ভাত খেতে বললে না।

ও প্রায় না থেমেই একটু হেসে বলে, আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা মেয়ের খাওয়া-পরার জন্য খরচ করতে চাও না বলেই বোধহয় তুমি বিয়ে করলে না।

ওর কথা শুনে আমি আর মা হো হো করে হেসে উঠি।

হাসি থামার পর বলি, দ্যাখ চাঁপা, আমাকে রাগিয়ে দিস না। আমি যদি রেগে যাই, তাহলে এখুনি গিয়ে বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে আসবো।

চাঁপা চাপা হাসি হেসে মাথা নেড়ে বলল, মানিকদা, তোমার সে মুরোদ নেই। সে মুরোদ ছিল তোমার দাদুর। তিনি বুক ফুলিয়ে তাঁর শ্বশুরকে বলেছিলেন, আপনার বিধবা মেয়েকে আমি বিয়ে করবো। এই সাহস তোমাদের কারুর নেই।

তুই আমার দাদুর বিধবা বিয়ের কথাও জানিস?

জানব না কেন? বাবার কাছে ঐ দাদু-দিদার কত কথা শুনেছি।

ও একটু হেসে বলে, ঐ দাদু-দিদা বাবাকে ঠিক নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন বলেই তো আমিও তোমাদের সংসারে ঠিক মেয়ের মত মহানন্দে দিন কাটাচ্ছি।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর মা বললেন, তবে মানিক, চাঁপা একটা খুব দামী কথা বলেছে।

কোন কথাটা দামী?

আগেকার দিনের মানুষদের যতটা চারিত্রিক বল ছিল, আজকালকার দিনে সত্যি তা দেখা যায় না।

উনি একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, আজকাল লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে কত লেখাপড়া শিখছে, কত উন্নতি করছে, কিন্তু আর একটা বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ

হচ্ছে না।

আমি মুখ নীচু করে বললাম, হ্যাঁ, মা, তুমি ঠিকই বলেছ।

খেয়েদেয়ে উঠে দাঁড়িয়েই চাঁপাকে বললাম, রবিবার দুপুরেই বন্ধুদের খেতে বলছি।

হ্যাঁ, বল।

ক'জনকে বলব বলতো?

ও মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, বড়মা, একসঙ্গে ছ'সাতজনের বেশি বললে বোধহয় রান্নাবান্নার অসুবিধে হবে, তাই না?

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছ'সাতজনের বেশি বলিস না। তার বেশি বললে সত্যি অসুবিধে হবে।

ঠিক আছে, ছ'সাতজনকেই বলব।

রবিবার দুপুরে আমরা সবাই খেতে বসার পর পরই মা বললেন, বুঝলে সাত্তার, শুধু চাঁপার জন্যই আজকে তোমাদের খাওয়াতে পারছি।

কেন কাকিমা? চাঁপাই বুঝি সব রান্না করেছে?

হ্যাঁ, রান্না তো করেছেই, তার চাইতেও বড় কথা, চাঁপা না বললে মানিক বোধহয় কোনোদিনই তোমাদের খাওয়ার কথা বলতো না।

মা হাসতে হাসতেই কথাগুলো বললেন।

হ্যাঁরে মানিক, কাকিমা কি বললেন, শুনলি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, মা ঠিকই বলেছেন।

পবিত্র বলল, দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে চাঁপা খুব সচেতন, তাই না মাসীমা?

হ্যাঁ, বাবা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মা ডান হাত দিয়ে চাঁপাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এই মেয়েটাকে পেয়ে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি।

সাত্তার বলল, চাঁপার মত বোন পেয়ে আমরাও খুব খুশি, কি বল পবিত্র?

সুধীর বলল, সাত্তার, শুধু শুকনো কথায় চিড়ে ভেজে না। চাঁপার বিয়ের সময় কিন্তু দাদা হিসেবে আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে, সেকথা ভুলে যাস না।

ওরা তিন-চারজন একসঙ্গে বলে উঠল, না, না, ভুলব না।

আমি বললাম, সত্যি চাঁপার বিয়েটা বেশ ভালভাবে দিতে হবে।

চাঁপা সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বলল, যে একটু শাক-সবজি কিনতে পারে না, সে আবার আমার বিয়ে দেবে? আমার বিয়ে দেবার জন্য আমার অনেক দাদা আছে।

সাত্তার চিৎকার করে উঠল, থ্রী চিয়ার্স ফর চাঁপা!

নিবারণকাকাকে হারাবার পর শুধু চাঁপার জন্যই আবার আমাদের বাড়ি আনন্দ-খুশিতে ভরে উঠল। ভুলেই গিয়েছিলাম, আনন্দের পিছনেই বেদনা, সুখের পিছনেই দুঃখ আমাদের জীবনে হানা দেবার জন্য ওত পেতে বসে থাকে।

ঘুম ভেঙে গেলেও আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এলো, চাঁপার আর্তনাদ, বড়মা!

আমি এক লাফে বিছানা ছেড়েই দক্ষিণের ঘরে গিয়েই দেখি, মা ঠিক খাটের পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। আমি আর চাঁপা মা'কে বিছানায় শুইয়ে দেবার জন্য তুলতে গিয়েই আমার হৃদপিণ্ড যেন থমকে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, যথারীতি সাত্তার ছুটে আসে কিন্তু একটা ইনজেকশানও দিতে হয় না। ও ঘরভর্তি লোকের সামনে পাঁজর কাঁপানো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অন্তত ঘণ্টা তিনেক আগেই সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত পৃথিবীটা ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবে গেল। আমি পাগলের মত চিৎকার করে মা'কে জড়িয়ে ধরলাম।

ঠিক মনে নেই, কতক্ষণ মা'কে জড়িয়ে ধরে আমি অঘোর ঘুমিয়েছিলাম। বন্ধুবান্ধবরা যখন আমাকে টেনে তুলল, তখন দেখি, সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

না, তারপর আমি আর চোখের জল ফেলিনি। বন্ধুদের সাহায্যে মা'কে গরদের কাপড় পরাবার পরই চাঁপা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, মানিকদা, আমি বড়মা'কে সাজিয়ে দেব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাঁপা, তুই-ই সাজিয়ে দে।

তারপর?

তারপর আর কি! নতুন পালঙ্কে, নতুন বিছানায় শুইয়ে মা'কে রাজমহিষীর মত সাজিয়ে-গুছিয়ে বিসর্জন দিয়ে এলাম।

আমি জানি, মানুষের জীবনে মৃত্যুই সবচাইতে বড় সত্য কিন্তু স্নেহ-মমতা প্রেম-প্রীতি ভালবাসার অক্টোপাসে দীর্ঘ বন্দী জীবন কাটাবার পর এই সত্য মেনে নেওয়া বা এই সত্যের মুখোমুখি হওয়ার চাইতে কঠিন পরীক্ষা মানুষকে দিতে হয় না। কি দুঃসহ, কি যন্ত্রণাদায়ক এই পরীক্ষা, তা আমি আমার দেহ-মনের সব সত্তা দিয়ে অনুভব করলাম।

আরো একটা কথা। বাবাকে হারাবার পর বার বার মনে হয়েছিল, আমার

জীবন-পথের সব আলো হঠাৎ নিভে গেল, হারিয়ে গেল আমার জীবনের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। নিবারণকাকাকে হারাবার পর মনে হয়েছিল, আমার জীবনযুদ্ধের প্রিয়তম সেনাপতি চলে গেলেন। আর মাকে চিরবিদায় দিয়ে মনে হল, আমার জীবনের আনন্দ-মাধুর্যের, অমৃত রসধারার মানস সরোবর চিরদিনের মত হারিয়ে গেল।

ঐ শ্মশান ঘাটে বসেই বন্ধুদের বললাম, ইহুদীদের একটা প্রবাদের কথা মনে হচ্ছে।

প্রবাদটা কী?

ভগবান সর্বত্র থাকতে পারেন না বলেই তিনি মায়ের সৃষ্টি করেছিলেন।

ওরা তিন-চারজন একসঙ্গে বলল, বাঃ! খুব সুন্দর প্রবাদ।

আমি আপন মনে বলি, গড কুড নট বী এভরিহোয়ার; দেয়ারফোর হি ক্রিয়েটেড মাদার!

কিছু না হারিয়ে বোধহয় কিছুই পাওয়া যায় না।

শ্মশান ঘাট থেকে বাড়ি ফিরেই দেখি, বন্ধুবান্ধব আর প্রতিবেশীদের মা-বোন-স্ত্রীরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। পবিত্র'র মা বললেন, মানিক, বাবা, আগে মায়ের ঘরে গিয়ে মায়ের ছবিতে প্রণাম করো।

দরজায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াই। অতি দুঃখের মধ্যেও মুগ্ধ হয়ে দেখি, মায়ের ঘরটাকে ঠিক মন্দিরের মত সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। অতি পরিপাটি বিছানার এক পাশে বালিশে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে মায়ের সেই হাসি মুখের রঙীন ছবি। সে ছবিও সাজানো হয়েছে চন্দন আর মালা দিয়ে। ছবির ঠিক পিছনেই ফুলদানীতে এক গাদা রজনীগন্ধা। হঠাৎ ধূপকাঠি চোখে পড়ল না কিন্তু ধূপের গন্ধে বড় ভাল লাগল।

মায়ের ছবিতে প্রণাম করে উঠতেই দেখি, ঘরের এক কোণে বসে চাঁপা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে। ও একবার মুখ তুলেও আমার দিকে তাকালো না। আমি এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর পিছন ফিরতেই সুধীরের স্ত্রীকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, বৌদি, এ ঘর তোমরা সাজিয়েছ?

না, মানিকদা, আমরা কেউ কিচ্ছু করিনি। সব চাঁপা করেছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমার মত এই মেয়েটাও বড্ড নিঃসঙ্গ হয়ে গেল।

যাই হোক, মা'র মৃত্যুর পর আমার বন্ধুবান্ধবদের বাড়ির লোকজনরা যা করলেন, তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে না যাওয়া পর্যন্ত পবিত্র'র

মা আমাদের এখানেই থেকে গেলেন। বললাম, মাসিমা, আপনি নিজের সংসার ফেলে এখানে আছেন বলে নিশ্চয়ই . . .

উনি আমাকে পুরো কথাটা না বলতে দিয়েই বললেন, আমার বড় বৌমা একাই একশ'। সুতরাং সংসার নিয়ে আমি চিন্তা করি না। তাছাড়া একটু-আধটু অসুবিধে হলেও এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে কী আমি যেতে পারি !

সুধীরের স্ত্রী রোজ সকালে এসে রাত ন'টা-সাড়ে ন'টার আগে কোনোদিনই ফিরে যায় না। ওকে বললাম, বৌদি, তুমি ছোট্ট বাচ্চাটাকে ফেলে এতক্ষণ আমাদের এখানে থাকাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।

আমার বাচ্চা তো সারা দিনরাত আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছেই থাকে।

শ্রীপর্ণা একটু থেমে একটু হেসে বলে, এই সময় তোমাকে না দেখলে তোমার বন্ধু আমাকে ডিভোর্স করে দেবে না?

সাত্তারের ছোটবোন রাবেয়া মা মারা যাবার পরদিন সকালেই দুধ আর ফল-টল এনে মুখ কাচুমাচু করে বলেছিল, মানিকদা, আমাদের এইসব খাবেন তো?

আমি ওর গাল টিপে আদর করে বলেছিলাম, আমি এইসব না খেলে মা আমাকে বকুনি দিয়ে শেষ করে দেবেন না?

তারপর থেকে প্রত্যেক দিন সকালবেলায় ঐ সুন্দর মেয়েটা দুধ-ফল-মিষ্টি দিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া চার-পাঁচজন বন্ধুর ভাইবোনেরা সকাল-বিকেল ফুল দিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরাও সকাল-বিকেল কত কি দিয়ে যাচ্ছে।

শ্রাদ্ধশান্তি ও লোকজন খাওয়ানোর সব বিধিব্যবস্থা করল বন্ধুবান্ধবরাই। আমি শুধু মন্ত্র পড়েছি।

সব মিশিয়ে এই আত্মীয়তা, এই ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

এইসব মিটে যাবার পর আবার ছাত্রছাত্রী পড়াতে শুরু করি। সংসার চালায় চাঁপা। আমি আর রবিবার সকালে আড্ডা দিতে চাই না। বন্ধুরাই আমাদের বাড়ি আসে। অন্যান্য দিন ওদের বাড়ি থেকে দু'একজন প্রায় নিয়মিতই আমার আর চাঁপার খোঁজখবর নিতে আসে। ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই কোনো-কোনোদিন দেখি, পবিত্র'র মা চাঁপার সঙ্গে গল্প করছেন।

মাসিমা, কখন এলেন?

তা ঘণ্টা খানেক হবে।

উনি একটু থেমে বললেন, তুমি তো তোমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকো। এই মেয়েটাকে তো একলা একলাই থাকতে হয়। তাই ভাবলাম, যাই,

চাঁপার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।

খুব ভাল করেছেন। আপনি এলে আমারও খুব ভাল লাগে।

তা জানি বাবা।

চাঁপার সঙ্গে গল্প করার জন্য রাবেয়া আর অখিলের বোন শীলাও প্রায় প্রত্যেক দিন আসে।

যেদিন কেউ আসে না, সেদিন বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আবার এক-একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দমেলা বসে যায় আমাদের বাড়িতে।

সন্ধেবেলার ছাত্রদের সওয়া ন'টা নাগাদ ছেড়ে দেবার পর ভিতরে এসেই দেখি, মা'র ঘরের সামনের বারান্দায় বসে কি সব কাটাকুটি করতে করতে শ্রীপর্ণা আর চাঁপা হাসাহাসি করছে। সঙ্গে সঙ্গেই খেয়াল হল, রান্নাঘরের মধ্যে চার-পাঁচজন লোক।

উঠোনে পা দিয়েই বললাম, বৌদি, কী ব্যাপার?

শ্রীপর্ণা একটু চাপা হাসি হেসে বলল, কী আবার ব্যাপার? এমনি এলাম।

হ্যাঁরে চাঁপা, রান্নাঘরে কারা?

গিয়েই দেখো।

রান্নাঘরে ঢুকেই দেখি, সাত্তার রান্না করতে-করতেই সুধীর আর পবিত্র'র সঙ্গে হাসাহাসি করছে। হাসতে হাসতেই বললাম, কী ব্যাপার রে?

ডেকচিতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে সাত্তার হাসতে হাসতে বলল, শ্রীপর্ণার সঙ্গে বাজি রেখে বিরিয়ানী রাঁধছি। তুই, পবিত্র আর চাঁপা এই বিরিয়ানী খেয়ে বলবি . . .

সুধীর, শ্রীপর্ণা আর তুই খাবি না?

হ্যাঁ, খাবো কিন্তু আমি আর শ্রীপর্ণা তো ভোট দিতে পারি না।

আর সুধীর?

ও হতভাগা হয়তো বউকেই সাপোর্ট করতে পারে। . . .

সেদিন কি আনন্দই হয়েছিল! বিরিয়ানী খাওয়া শুরু করার পর পরই শ্রীপর্ণা বলল, সাত্তারদা, দারুণ হয়েছে।

সাত্তার বলল, তুমি হার স্বীকার করছো?

শ্রীপর্ণা হাসতে হাসতে বলল, সানন্দে স্বীকার করছি।

পবিত্র বলল, তোরা দু'জনে বারোটা বাজিয়ে দিলি। জীবনে এই প্রথম জজ্ হবার সুযোগ পেয়েও তোরা আমাদের বিচার করার সুযোগ না দিয়েই মামলা তুলে নিলি?

বিরিয়ানী খাবার পর আনারসের চাটনি মুখে দিয়েই আমি বললাম, চাটনিটাও দারুণ হয়েছে।

চাঁপা বলল, হ্যাঁ, বৌদি, সত্যি দারুণ হয়েছে।

সাত্তার বলল, হ্যাঁরে, সুধীর, তুই কী এইরকম চাটনি খেয়েই শ্রীপর্ণাকে পছন্দ করেছিলি?

তখন চাটনি খেয়েই পছন্দ করেছিলাম কিন্তু এখন রোজ আমাকে ঘোল খাওয়াচ্ছে।

চাটনির পর পায়েস মুখে দিয়েই সাত্তার বলল, চাঁপা, ঠিক কাকিমার মতই তুমি পায়েস করতে শিখেছ।

বড়মার কাছে শিখলেও আমার পায়েস অত ভাল হয় না।

শ্রীপর্ণা বলল, হ্যাঁ চাঁপা, সত্যি মনে হচ্ছে, কাকিমার হাতের পায়েস খাচ্ছি।

আমি বললাম, শুধু পায়েস কেন, চাঁপা অনেক কিছুই ঠিক মা'র মত রান্না করতে শিখেছে।

কী যে বল মানিকদা? বড়মা'র রান্নার সঙ্গে আমার রান্নার তুলনা হয়?

ও একটু থেমে বলে, প্রায় তেল-মসলা না দিয়ে বড়মা শাক-পাতা রাঁধলে তা দিয়েই পুরো ভাত খাওয়া হয়ে যেতো। সারা জীবনেও আমি ঐ ধরনের রান্না রাঁধতে পারবো না।

মা মারা যাবার পর এইভাবেই দু'তিনটে মাস কেটে গেল।

সেদিন সকালবেলার ছাত্রছাত্রীরা চলে যাবার পর বৈঠকখানায় বসেই কিছু লেখাপড়ার কাজ করছিলাম। তারপর একটা বই আমার ঘর থেকে আনার জন্য উঠোনে নেমে একটু এগুতেই সপ্‌সপে ভেজা কাপড়ে চাঁপাকে সামনে দেখেই থমকে দাঁড়াই। চাঁপাও অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে এক পলকের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই দৌড়ে ওর ঘরে ঢুকে যায়।

চাঁপাকে রোজ দেখি সকাল-বিকেল-সন্ধে আর রাত্রিতে। আমি জানি, তার দেহে বসন্তের জোয়ার এসেছে অনেক দিন কিন্তু জানতাম না সে জোয়ারের ব্যাপকতা, গভীরতা, মাদকতা। ধীর পদক্ষেপে ঘরে গেলাম, টেবিলের উপর থেকে বই নিয়ে বৈঠকখানায় ফিরে গেলাম কিন্তু পড়াশুনায় মন দিতে পারলাম না। সপ্‌সপে ভেজা কাপড়ে চাঁপাকে দেখার কথাই বার বার মনে হল।

শুধু সেদিন না, শুয়ে-বসে থাকলেই ক'দিন শুধু চাঁপার কথাই ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, না, না, এভাবে চাঁপার আর আমার এক বাড়িতে থাকা ঠিক শোভনীয় না। আমি জানি, আমি অসৎ চরিত্রহীন না। চাঁপার প্রতি আমার

বিন্দুমাত্র কামনা-বাসনা-লালসা নেই কিন্তু তবুও তো আমি অতি সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ। কোনও বিশেষ পরিস্থিতির বিশেষ মুহূর্তে যে আমি আমার সমস্ত ন্যায়-অন্যায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলব না, তার কি কোনও ঠিকঠিকানা আছে?

বেশ কয়েক দিন ধরে আরো কত কি চিন্তা-ভাবনা করলাম। আমার বন্ধুবান্ধরা আমাকে চেনে জানে বিশ্বাস করে। আমার উপর ওদের ষোল আনা আস্থাও আছে। ওরা খুব ভাল করেই জানে, আমার দ্বারা চাঁপার কোনও ক্ষতি বা অসম্মান অমর্যাদা হবে না। কিন্তু আমার ছাত্রছাত্রী, প্রতিবেশী বা অন্যরা যদি অন্য কিছু ভাবে, অন্য কিছু সন্দেহ করে, তাহলে? ওদের গুঞ্জন, ওদের সমালোচনা আমি বন্ধ করবো কেমন করে?

এইসব সাত-পাঁচ চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত একটু বেদনাদায়ক একটু কঠিন সিদ্ধান্তই মনে মনে নিতে বাধ্য হলাম।

না, আমি আর চাঁপা এভাবে থাকতে পারি না। থাকা উচিত না।

•

পরের রবিবার সকালে আমাদের আড্ডা বসল সুধীরের বাড়ি। আগে থেকে ঠিক করেছিলাম, চাঁপার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের কথা ওদের জানাবো কিন্তু কেন যে বলতে পারলাম না, তা জানি না।

বেলা একটা নাগাদ বাড়ি ফিরতেই চাঁপা লাফাতে লাফাতে এসে বলল, ছোটজ্যেঠু এসেছেন।

অবাক হয়ে বললাম, ছোটজ্যেঠু মানে মাধব পণ্ডিত মশাই?

ও এক গাল হেসে বলল, তবে আবার কে?

এই মাধব পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক হৃদ্যতা বহুকালের। উনি বাবার সহকর্মী হলেও বাবাকে ঠিক নিজের বড় ভাইয়ের মত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। ওদিকে আমার এক দূর সম্পর্কের মামার সহপাঠী ছিলেন বলে আমার দাদু-দিদিমার ওখানেও নিয়মিত যাতায়াত ছিল এবং সেই সুবাদেই পরবর্তীকালে উনি ঠাকুমাকে বলে মা'র সঙ্গে বাবার বিয়ের ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেন ও শেষ পর্যন্ত ওদের বিয়ে হয়। এই দুটি কারণে বাবা-মা দু'জনেই ওঁকে অত্যন্ত আপনজন মনে করতেন।

আমার বেশ মনে আছে, আমার ছোটবেলায় বিশেষ কাজে বাবা নিবারণকাকাকে নিয়ে চণ্ডীতলা গেলে ছোটজ্যেঠু সব সময় ছোটমা'কে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। তাছাড়া মা আর ছোটমা 'সই' পাতিয়েছিলেন।

যাই হোক, ছোটজ্যেঠু কাটোয়ার স্কুল থেকে রিটায়ার করার পর ছোটমা'কে নিয়ে রানাঘাট চলে যান। ওখানে চলে যাবার পর ছোটমা দু'দিনবার আমাদের

এখানে এসে বেশ কিছুদিন করে থেকেছেন। তবে গত বছর দুই শারীরিক কারণে আর আসতে পারেননি। ছোটজ্যেঠুও বোধহয় বছর তিনেক পর এলেন।

ভিতরে গিয়ে ছোটজ্যেঠুকে প্রণাম করতেই উনি আমার মাথায় দু'হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, নকুলের চিঠিতে তোর মা'র মৃত্যু সংবাদ পেয়েও তোর ছোটমা'র অসুস্থতার জন্য কিছুতেই আসতে পারলাম না।

ছোটমা এখন কেমন আছেন?

ভাল না; বাতে পঙ্গু হয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকেই জিজ্ঞেস করলাম, রাধা কেমন আছে?

ও ভালই আছে।

জামাই হাওড়ার সেই আগের কারখানাতেই কাজ করছে?

না, না, ওরা এখন জামসেদপুরে থাকে। আর জামাইও চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করছে।

এতক্ষণ চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকার পর চাঁপা বলল, মানিকদা, চট করে চান করে এসো। ছোটজ্যেঠুর বুঝি খিদে পায় না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি।

খেতে বসে ছোটজ্যেঠু বললেন, বুঝলি মানিক, এই মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র ঠিক নিবারণদার মতই হয়েছে। মানুষকে এত সেবা-যত্ন করতে পারে যে তা বলার না।

তা ঠিক।

আবার একটু পরে উনি বললেন, চাঁপার হাতের রান্না খেয়ে মনে হচ্ছে যেন বৌমার হাতের রান্নাই খাচ্ছি।

চাঁপা একটু হেসে বলল, ছোটমা'ও আমাকে বেশ কয়েকটা রান্না শিখিয়েছেন।

ছোটজ্যেঠু ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর ছোটমা তোর কথা প্রায়ই বলেন।

খেয়েদেয়ে ওঠার পর ছোটজ্যেঠু আবার আমার সঙ্গে টুকটাক আলোচনা শুরু করতেই চাঁপা ওঁর একটা হাত ধরে বলল, এখন আর কথাবার্তা না বলে শুতে চলুন তো। সন্ধের পর আবার গল্প করবেন।

বিকেলবেলায় চা খেতে খেতে ছোটজ্যেঠু বললেন, এখানকার পোস্টাফিসে আমার দু'তিন হাজার টাকা পড়ে আছে। কাল ঐ টাকাটা তুলে নিয়েই আমি চলে যাবো।

আমি কিছু বলার আগেই চাঁপা বলল, না, না, ছোটজ্যেঠু, কালকে আপনি যেতে পারবেন না। এতদিন পর এসে কোনোমতে এক রাত কাটিয়েই পালাবেন,

তা হয় না।

আমিও বললাম, হ্যাঁ, ছোটজ্যেঠু, দু'চারদিন থেকে যান।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, থাকতে তো খুবই ইচ্ছা করে কিন্তু তোদের ছোটমা'কে ফেলে থাকি কী করে? ও যে একেবারেই পঙ্গু হয়ে গেছে।

একেবারে পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন মানে? হাঁটা-চলাও করতে পারেন না?

না, লাঠি নিয়েও আজকাল হাঁটতে পারে না।

ছোটজ্যেঠু মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, আমাকে রান্নাবান্না করে ওকে খাইয়ে-দাইয়ে দেওয়া ছাড়া আমাকে কি করতে হয় না? আমি শাড়ি পরাতে পারি না বলে আজকাল লুঙ্গি পরিয়ে রাখি।

ইস!

চাঁপা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ছোটজ্যেঠু, আমি কিছুদিন আপনার ওখানে গিয়ে থাকবো?

মা, তাহলে তো আমি হাতে স্বর্গ পাবো কিন্তু এখানে মানিকের কী হবে?

আমি বললাম, না, না, আমার জন্য চিন্তা করবেন না। এখন আমাকে দেখার চাইতে ছোটমা'কে দেখাশুনা করা অনেক বেশি দরকার।

চাঁপা বলল, ঠিক বলেছ মানিকদা। ছোটজ্যেঠু, আমি কালই আপনার সঙ্গে যাবো।

ঠিক আছে, তোকে নিয়েই যাবো।

ছোটজ্যেঠু একটু থেমে চাঁপার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে কাছে পেলে যে তোর ছোটমা কি খুশি হবে, তা ভাবা যায় না।

পরের দিন দুপুরেই ছোটজ্যেঠুর সঙ্গে চাঁপা চলে গেল।

পাঁচ

চাঁপা চলে যাওয়ায় একদিক দিয়ে স্বস্তিবোধ করলেও আমি যে কি সমস্যায় পড়লাম, তা ভগবানই জানেন।

সেই ছোটবেলা থেকে আমাকে পড়াশুনা ছাড়া কোনোদিন কোনও কাজ করতে হয়নি। সবকিছু করে দিতেন মা আর নিবারণকাকা। চাঁপা আসার পর থেকে আস্তে আস্তে ও আমার সবকিছু সামলেছে। ইদানীং বছর খানেক রোজ রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর এক-আধ ঘণ্টা পড়াশুনা না করলে সকালে ছেলেমেয়েদের পড়াতে বেশ অসুবিধে হতো। একটু বেশি রাত পর্যন্ত পড়াশুনা

করলেই চাঁপা এসে হাজির হতো।

মানিকদা, ক'টা বাজে জানো?

হাতের ঘড়ি দেখে নিয়েই বলি, পৌনে একটা।

আর কখন ঘুমোবে বল তো?

ও একটু থেমে বলবে, এত রাত্তিরে ঘুমিয়ে কী করে ভোরবেলায় উঠবে?

আমি একটু হেসে বলি, এখুনি ঘুমোব।

এবার ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, এত রাত পর্যন্ত তুই কেন জেগে আছিস?

বাঃ! তুমি ঘুমোবার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব, তাই কখনো হয়?

আচ্ছা তুই যা! আমি দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বো।

তুমি দশ-পনের মিনিট পড়ে নাও। তারপর আমি আলো নিভিয়ে শুতে যাচ্ছি।

তুই মহা ঝামেলা করিস।

আমি বইখানা বালিশের পাশে রেখে বলি, তুই আলো নিভিয়ে চলে যা।

ও আলো না নিভিয়ে বইখানা তুলে আমার হাতে দিয়ে একটু হেসে বলে, তুমি আর একটু না পড়ে শান্তিতে ঘুমুতে পারবে না।

আমি মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে বলি, মা আর নিবারণকাকা ছাড়া শুধু তুই-ই আমাকে বুঝেছিস।

এত রাত্তিরে ঘুমুতে যাই বলে ভোরবেলায় কেউ ডেকে না দিলে কিছুতেই ঘুম ভাঙে না। আগে মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাকতেন, মানিক, বাবা উঠে পড়। আর দেরি করে উঠলে যে ছেলেমেয়েগুলো এসে যাবে। ওঠ বাবা, চা হয়ে গেছে।

চাঁপা আমাদের এখানে আসার দু'তিন মাস পরে থেকেই মা আর আমাকে নিয়মিত ঘুম ভাঙাতে আসতেন না। মা না এলেই চাঁপা আমাকে ডেকে দিতো। ইদানীং বছর দুয়েক বারান্দায় ওঠা-নামা করতে মা'র কষ্ট হতো বলে চাঁপাই রোজ আমাকে ডেকে দিয়েছে।

মানিকদা! মানিকদা!

আমার সাড়াশব্দ না পেয়ে ও আবার ডেকেছে, মানিকদা, প্লীজ উঠে পড়ো। আর দেরি করো না।

আমার কানে ওর কথাগুলো এলেও আমি উঠতে পারি না। পাশ ফিরে শুতে শুতেই জিজ্ঞেস করি, ক'টা বাজে?

প্রায় ছ'টা বাজে।

ও মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলে, এর পর উঠলে যে তুমি চা-টা খাবারও সময় পাবে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যে তোমার ছাত্রছাত্রীরা এসে হাজির হবে।

কোনো-কোনদিন আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেই শুনি, ও আপনমনে বলছে, তোমাকে এভাবে জোর করে ঘুম ভাঙাতে এত খারাপ লাগে যে কি বলব! কিন্তু না ডেকেও তো পারি না। সাড়ে ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই তো ছেলেমেয়েরা এসে যাবে।

আমি চোখ মেলে তাকাতেই ও বলে, যাও, চট করে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো।

মা যখন ছিলেন, তখন আমি আর মা বারান্দায় বসে চা খেতাম। মা মারা যাবার পর একলা একলা বারান্দায় বসে চা খেতে ভাল লাগতো না বলে আমার ঘরে বসেই চা খেতাম। বাথরুম না গিয়ে আমাকে ঘরে বসে থাকতে দেখলেই চাঁপা আবার এসে হাজির হবে।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে, কী, আর এক কাপ চা দেব?

দিলে তো ভালই হয়।

এতক্ষণ চুপ করে বসে না থেকে আমাকে ডেকে তো বলতে পারতে, চাঁপা, এক কাপ চা দিয়ে যা।

না চাইতেই তো সবকিছু পেয়ে যাই।

তাই বলে কী কখনই কিছু চাইতে নেই?

ও মুহূর্তের জন্য থেমে তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি বোধহয় আমাকে ঠিক আপন ভাবতে পারো না, তাই না মানিকদা?

আমি একটু হেসে জিজ্ঞেস করি, কেন, তোর কী তাই মনে হয়?

ও আপন মনে একটু ভেবে-চিন্তে বলে, না, ঠিক তা মনে হয় না কিন্তু মাঝে মাঝে খটকা লাগে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলি, দ্যাখ চাঁপা, মা মারা যাবার পর তুই ছাড়া আমার আপনজন আর কে আছে বল?

সেই সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে মাঝরাত্তিরে ঘুমুতে যাবার সময় পর্যন্ত আমার প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে চাঁপা নজর দিয়েছে। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে চা খেয়েই আমি বাথরুমে যাই। বাথরুমে গিয়ে প্রত্যেক দিন

দেখব, চান করার পর পরার জন্য আণ্ডারওয়ার, পায়জামা আর গেঞ্জি এক পাশে রাখা আছে। অন্য দিকে আমার শুকনো তোয়ালে ঝুলছে। সাবান ছোট হয়ে গেলেই আবার একটু নতুন সাবান রেখে দিয়েছে। আমার পেস্ট বা শেভিং ক্রীম ফুরিয়ে আসছে কিনা তাও ও খেয়াল রাখে।

আগে আমি মাঝে মাঝে মা'কে বলতাম, আচ্ছা মা, চাঁপা কী ভাবে, আমি এই বাড়ির নতুন জামাই?

মা অবাক হয়ে বলতেন, তার মানে?

বাথরুমে গিয়ে দেখব, ও আমার ব্রাশে পেস্ট দিয়ে রেখেছে, শেভিং ব্রাশ ভিজিয়ে রেখেছে, চান করে উঠে পরার জন্য কাপড়-চোপড় ঠিক করে রাখা থেকে শুরু করে . . .

আমার কথার মাঝখানেই মা হাসতে হাসতে বলতেন, তাই বল!

উনি একটু থেমে বলেন, চাঁপা তো আমাকেও কিছু করতে দেয় না। ওর জন্য আমিও তো বেশ নবাবনন্দিনীর মত মহাসুখে দিন কাটাচ্ছি।

চাঁপা রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে বলে, সারাজীবনই তো সংসার ঠেলেছ। এখন যখন আমি আছি, তখন আর শুধু শুধু খাটাখাটনি করবে কেন?

আমি চাঁপার দিকে তাকিয়ে বলি, আর আমি?

তুমি যাতে চটপট বাথরুম থেকে বেরুতে পারো, তাই . . .

তাই বুঝি আমি ব্রাশে পেস্টও নিতে পারি না?

পারবে না কেন? সবই পারো।

তবে?

তবে আর কী? আমার যা উচিত মনে হয়, তাই আমি করি।

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আর কিছু বলবে মানিকদা?

একটা কথা বলে রাখছি, আমি যদি কোনোদিন বাতে পঙ্গু হই, তাহলে তুই দায়ী হবি।

আগে আমি নাইন-টেন'এর ছেলেমেয়েদের পড়ালেও পরে আর পড়াইনি। গত কয়েক বছর ধরে সকালে ইলেভেন-টুয়েলভ'এর ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছি। সন্ধের সময় কলেজের ছেলেমেয়েরা আসে। তবে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াই না। সপ্তাহে তিন দিন ছেলেদের, অন্য তিন দিন মেয়েদের পড়াই।

সকালবেলার ছেলেমেয়েরা ন'টা-সওয়া ন'টার মধ্যেই চলে যায় কিন্তু তখনই আমার ছুটি হয় না। আমি দু'বেলাতেই মোটামুটি আড়াই ঘণ্টা করে পড়াই। ঐ

সময়ের মধ্যে প্রত্যেক দিন একটি করে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয় ঠিক তিরিশ মিনিটের মধ্যে। সকালবেলার ছেলেমেয়েরা চলে যাবার পরই ঐ বৈঠকখানায় বসে দু'বেলার ছেলেমেয়েদেরই খাতা দেখি।

খাতা দেখা শুরু করতে-না-করতেই চাঁপা এক গেলাস দুধ নিয়ে হাজির হবে। বলবে, চট করে দুধটা খেয়ে নাও তো।

আমি খাতা দেখতে-দেখতেই বলি, তুই রেখে যা।

আমি রেখে গেলে আর তুমি খেয়েছ!

আঃ! বিরক্ত করিস না। বলছি তো . . .

এত কথা না বলে খেয়ে নিলেই আর বিরক্ত করতে হয় না।

মোদ্দা কথা, আমাকে দুধ না খাইয়ে চাঁপা কিছুতেই নড়বে না।

দুপুরবেলায় আমি কিছুতেই ঘুমুতে পারি না। আগে খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ মা'র পাশে শুয়ে গল্পগুজব করার পর নিজের ঘরে এসে শুয়ে শুয়ে বইপত্তর পড়তাম। আর মা খবরের কাগজ পড়ার পর চাঁপাকে পড়াতেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে-না-হতেই আমি মা'র ঘরে এসে বলতাম, মা, তোমার পাঠশালা আর কতক্ষণ চলবে?

কেন?

বড্ড চা খেতে ইচ্ছে করছিল।

মা কিছু বলার আগেই চাঁপা বলবে, মিনিট দশেক পরই আমি তোমাকে চা দিচ্ছি।

চা খেতে-খেতেই আবার কিছুক্ষণ মা'র সঙ্গে গল্পগুজব করতাম। মাঝে মাঝে চাঁপা বলতো, যাই বল বড়মা, তোমার ছেলে বেশ আড্ডাবাজ।

মা উত্তর দেন, নিজের পড়াশুনা-কাজকর্মের পর মানিক একটু গল্পগুজব না করে থাকতে পারে না।

মা মারা যাবার পর আমি খেয়েদেয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই চাঁপা বলতো, মানিকদা, তুমি ঘরে গিয়ে খবরের কাগজ পড়ো। আমি রান্নাঘরের কাজকর্ম মিটিয়েই আসছি।

চাঁপা খেয়েদেয়ে রান্নাঘরের কাজকর্ম শেষে করে আমার ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে বলে, জানো মানিকদা, আজ শ্রীপর্ণা বৌদি কি বলছিলেন?

বৌদি কি এসেছিল নাকি?

হ্যাঁ।

কখন এসেছিল?

তখন তুমি ছেলেদের পড়াচ্ছিলে।

ও!

সঙ্গে-সঙ্গেই জিজ্ঞেস করি, এমনি এসেছিল? নাকি কোনও কাজে এসেছিল?

চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, তোমার বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি ভালমন্দ কিছু হলেই তো আমাদের বাড়ি আসবেই। সুধীরদার মা ক্ষীরের সন্দেশ তৈরি করেছিলেন বলে শ্রীপর্ণা বৌদি তাই দিতে এসেছিলেন।

বাঃ! বেশ ভাল খবর দিলি। আগে জানলে দু'একটা টেস্ট করে দেখতাম।

সেইজন্যই তো আগে খবরটা জানাইনি।

কেন? আগে জানালে কী হতো?

মিষ্টি খাবার পর কী ভালভাবে ভাত খেতে?

ও প্রায় না থেমেই বলে, শ্রীপর্ণা বৌদি তোমার দারুণ প্রশংসা করছিলেন।

হঠাৎ প্রশংসা করার মত কী করলাম?

প্রশংসা করার অনেক কারণ আছে।

হেঁয়ালি না করে খোলাখুলি বল তো কি ব্যাপার।

তাহলে শোনো।

হ্যাঁ, বল।

ও একটু চাপা হাসি হেসে বলে, তোমার সব ছাত্রীদের মধ্যে শিবানীকে তো সবচাইতে দেখতে ভাল।...

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, তাতে কী হলো?

তোমার আবার কী হবে? কিন্তু মেয়ে ডাকসাইটে সুন্দরী হবার জন্য ওর মায়ের তো দুশ্চিন্তার শেষ নেই।...

এবার আমি একটু রাগ করেই বলি, শিবানীর মা'র দুশ্চিন্তার খবর তুই জানলি কি করে? তাছাড়া এসব আলতু-ফালতু কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না, তা কী তুই জানিস না?

চাঁপা বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, খুব ভাল করেই জানি। তুমি আমার পুরো কথাটা না শুনেই রেগে যাচ্ছো।

আমি চুপ করে থাকলেও ও বলে যায়, শিবানীর মা কি কাজে যেন সুধীরদার কাছে গিয়েছিলেন। তখনই উনি কথায় কথায় শ্রীপর্ণা বৌদিকে বলেছেন, তোমার মত ভদ্র সভ্য চরিত্রবান ছেলে আজকাল বিশেষ দেখাই যায় না।

আমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকলেও চাঁপা একটু থেমেই বলে যায়, শ্রীপর্ণা বৌদি ওকে বলেছেন, মাসিমা, চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু মানিকদার কোনও কলঙ্ক নেই। আমি বোধহয় আমার বাবা-মা'র চাইতেও মানিকদাকে বেশি শ্রদ্ধা

করি।

আমি কী বলবো? আগের মতই চুপ করে শুয়ে থাকি।

জানো মানিকদা, কথাটা শুনে আমার খুব ভাল লাগলো।

চাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বাবা যখনই বাড়ি যেতেন, তখনই শুধু বড়মা আর তোমার প্রশংসা করতেন কিন্তু তোমরা যে সত্যি-সত্যিই এত ভাল, আমি তা আগে ভাবতে পারিনি।

আমার বন্ধুবান্ধবরা ছাড়াও ওদের বাড়ির অন্য অনেকেই মাঝে-মধ্যে আমার খবরাখবর নিতে আসেন। সেদিন সকালবেলার ছেলেরা চলে যাবার পর বৈঠকখানা থেকে বাড়ির ভিতরে গিয়েই দেখি, পবিত্র'র মা এসেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, মাসিমা, কখন এলেন?

এই একটু আগে এসেছি।

মাসিমা একটু থেমে বলেন, রোজ যে একবার তোমাদের খোঁজখবর নেব, তা কিছুতেই পেরে উঠি না। তাছাড়া বড় নাতির জ্বর হয়েছিল বলে ও কিছুতেই আমাকে ছাড়তো না।

ও এখন কেমন আছে?

কাল থেকে আর জ্বর হয়নি। তাই আজকে আসতে পেরেছি।

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানেই চাঁপা এক প্লেট আম এনে মাসিমার সামনে রেখে বলে, মাসিমা, খেতে খেতে গল্প করুন। আমি এখুনি চা দিচ্ছি।

মাসিমা বলেন, আচ্ছা চাঁপা, যখন আসবো, তখনই কী কিছু খেতে হবে?

ও একটু হেসে বলে, বড়মা আমাকে শিখিয়েছেন, বাড়িতে যে কেউই আসুক, সে যেন কখনই শুধু মুখে ফিরে না যায়।

সত্যি চাঁপা, মাঝে মাঝে মনে হয়, বি.এ-এম.এ.পাস করা মেয়েগুলো তোর কাছে এসে ভদ্রতা সভ্যতা শিখে যাক। তোর সত্যি কোনো তুলনা হয় না।

কী যে বলেন মাসিমা! যা কিছু শিখেছি, সবই তো বড়মা শিখিয়েছেন। এর মধ্যে আমার কোনও কেরামতি নেই।

চাঁপা সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে চলে যেতেই মাসিমা বলেন, সত্যি মানিক, এই মেয়েটার কোনও তুলনা হয় না।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, ও তোমার বাবা-মা'র ঘরখানা এমন সুন্দর করে রেখেছে যে দেখলে চোখ আর মন দুই-ই জুড়িয়ে যায়।

আমি বলি, হ্যাঁ, মাসিমা, ঠিকই বলেছেন। ও ঘরে ঢুকলেই আমার মনে হয়, মা অন্য কোথাও গিয়েছেন। উনি এখুনি ফিরে এসে খবরের কাগজ বা বই পড়তে বসবেন।

ঠিক বলেছ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তোমার মা'র বিছানাপত্তর, কাপড়-চোপড়, বই, চিঠি লেখার কাগজ, কলম, চশমা এমন সুন্দরভাবে রয়েছে যে হঠাৎ দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না, মানুষটা চার বছর আগেই চলে গেছেন।

চাঁপা মাসিমা আর আমাকে চা দেয়। চা খেতে-খেতেও টুকটাক কথাবার্তা হয়। চা খাওয়া শেষ করে মাসিমা উঠে দাঁড়িয়েই আমাকে বলেন, মানিক, যাচ্ছি; আবার সময় পেলেই ঘুরে যাবো।

হ্যাঁ, মাসিমা, নিশ্চয়ই আসবেন।

এবার উনি চাঁপার মাথায় হাত দিয়ে বলেন, চলি মা।

চাঁপা একটু হেসে বলে, মাসিমা, আমার একটা কথা রাখবেন?

নিশ্চয়ই রাখবো; বল কি কথা।

আপনি একদিন আমাদের কাছে থাকুন। আপনি থাকলে আমাদের খুব ভাল লাগবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ মাসিমা, একটা দিন আমাদের কাছে থাকুন।

মাসিমা দু'হাত দিয়ে চাঁপার মুখখানা ধরে বললেন, মা, কথা যখন দিচ্ছি, তখন নিশ্চয়ই থাকবো।

উনি বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বলেন, তোরাও তো আমাব ছেলেমেয়ের মত। তোদের কাছে থাকলে আমারও কী কম ভাল লাগবে।

চাঁপা রান্নাঘরের দিকে এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল, আমি জানতাম মাসিমা, আপনি আমার কথা ফেলতে পারবেন না।

সদর দরজার দিকে এগুতে এগুতে মাসিমা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মানিক, এই মেয়েটার কর্তব্যজ্ঞান আর ভালবাসা দেখে অবাক হয়ে যাই। অনেক বাড়ির মেয়ে-বউরাও তো এভাবে আপন ভেবে আমাকে থাকতে বলে না!

আমি বললাম, হ্যাঁ মাসিমা, চাঁপার কর্তব্যজ্ঞান বা ভালবাসার কোনও তুলনা হয় না।

সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম নেবার সময় চাঁপাকে মাসিমার এইসব কথা বলতেই ও বলল, মাসিমা আমাকে মেয়ের মত স্নেহ করেন বলেই তো আমি ওঁকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করি।

ও দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বলে, জানো মানিকদা, তুমি সত্যি খুব ভাগ্যবান।

আমি একটু হেসে বলি, হঠাৎ আমাকে ভাগ্যবান বলছিস কেন?

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, একশ'বার তুমি ভাগ্যবান। তোমার

বাবা বা ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে আমি দেখিনি কিন্তু বাবার কাছে তো তাঁদের কথা শুনেছি। আর বড়মাকে তো আমি প্রায় বছর পাঁচেক দেখেছি।

চাঁপা আমার চোখের পর চোখ রেখে বলে, কত ভাগ্যবান হলে অমন ঠাকুর্দা-ঠাকুমার নাতি আর অমন বাবা-মা'র ছেলে হওয়া যায়, তা ভাবতে পারো?

হ্যাঁ, এদিক দিয়ে আমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান।

শুধু এদিক দিয়ে কেন, আরো অনেক দিক দিয়েই তুমি ভাগ্যবান।

চাঁপা একটু থেমে বলে, তোমার মত বন্ধুভাগ্য ক'জনের হয় বলতে পারো? তোমার বন্ধুরা তো তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

হ্যাঁ, সত্যি ওরা আমাকে খুব ভালবাসে।

শুধু বন্ধুরা কেন? তাদের বাড়ির লোকজন তোমাকে ভালবাসে না?

নিশ্চয়ই ভালবাসে।

শ্রীপর্ণা বৌদি বোধহয় নিজের ছেলে বা স্বামীর চাইতেও তোমাকে বেশি ভালবাসে।

ও একটু থেমে বলে, উনি তো সবার সামনেই বলেন, দু'একদিন পর পরই মানিকদাকে না দেখলে আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি। ওকে একবার চোখের দেখা দেখলেও আমার মন জুড়িয়ে যায়।

হ্যাঁ, আমি জানি, শ্রীপর্ণা বৌদি আমাকে ঠিক যমজ ভাইয়ের মতই ভালবাসে কিন্তু মুখে কিছু বলি না।

চাঁপা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ভাবতে পারো, কত ভালবাসলে একটা অন্য বাড়ির বউ এভাবে শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামীকে তোমার কথা বলতে পারে?

মা না থাকলেও খাওয়া-দাওয়ার পর চাঁপার সঙ্গে এইভাবে গল্প করে দু'এক ঘণ্টা বেশ কেটে যেত। ও নিজের ঘরে চলে যাবার পর আমি বইপত্তর পড়ি। কদাচিৎ কখনও বইপত্তর পড়তে-পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ি। চাঁপা ঘুম ভাঙিয়ে চা দিতেই জিজ্ঞেস করি, ক'টা বাজে?

প্রায় সাড়ে পাঁচটা।

সেকি রে? আগে ডাকিসনি কেন?

আমি দু'বার চা নিয়ে ঘুরে গেছি, তা জানো?

আমি কিছু বলার আগেই ও বলে, তুমি এমন অঘোরে ঘুমুচ্ছিলে যে বেশি ডাকাডাকি করিনি। তাছাড়া ছ'টার আগে তো ছেলেরা আসবে না।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলি, দুপুরে ঘুমুলে যে রাত্তিরে ঘুম আসতে

চায় না।

চাঁপা একটু হেসে বলে. ঘুম না এলে আমি বড়মা'র মত তোমার মাথায় হাত দিতে দিতে ঘুম পাড়িয়ে দেব।

সন্ধেবেলার ছেলেমেয়েরা ঠিক ছ'টায় এসে যায়। মেয়েদের ন'টা সওয়া-ন'টার মধ্যেই ছেড়ে দিই। কেনো-কোনোদিন সাড়ে ন'টাও হয়ে যায়। ভারতী আর রেখা তো আমাদের পাড়ারই মেয়ে। সুতরাং একটু দেরি হলেও ওদের কোনও অসুবিধে হয় না। বনানীর বড়দা দোকান বন্ধ করে রিক্সায় বাড়ি ফেরার পথে ওকে নিয়ে যান। শিবানীর বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। সাধারণত ওর মেজদা বা ছোড়দা এসেই ওকে নিয়ে যায়। যদি কোনোদিন কোনো কারণে ওরা না আসে, তাহলে আমি নিজে গিয়ে ওকে কালু বা সনাতনের রিক্সায় চড়িয়ে দিয়ে আসি।

তবে যে তিন দিন ছেলেরা পড়তে আসে, সেদিন পৌনে দশটা-দশটার আগে কোনোদিনই ওরা যায় না। এই তিন দিন ঘণ্টা চারেক ধরে ওদের পড়াবার পর বড্ড ক্লান্তবোধ করি। আমার খেতেও ইচ্ছে করে না, কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। তাইতো বৈঠকখানা থেকে সোজা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই চাঁপা ধীর পদক্ষেপে আমার ঘরে এসে আমার খাটের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচ-সাত মিনিট ঐভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর আপন মনেই বলে, এইভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করে কেউ ছাত্রছাত্রী পড়ায় না। ওদের কলেজে কী কিছু পড়াশুনা হয় না? সবই যদি এখানে এসে পড়তে হয়, বুঝতে হয়, তাহলে সারাদিন কলেজে কাটাবার দরকার কী?

আমি কোনও কথা বলি না। চুপ করে শুয়েই থাকি।

আবার একটু চুপ করে থাকার পর ও বলে, তুমি ভাল মানুষ বলে সবাই তোমাকে ঠাকাচ্ছে। আজকালকার দিনে কেউ দু'শ-আড়াই শ' টাকায় কলেজের ছেলেমেয়েদের তিন-চারটে বিষয় পড়ায় না। তোমার বদলে অন্য কেউ হলে পাঁচ শ' টাকার এক পয়সা কম নিয়ে এভাবে পড়াতেন না।

এবার আর চুপ করে থাকি না। একটু হেসে বলি, তোর কী ধারণা, যারা আমার কাছে পড়ে, তারা সবাই খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলেমেয়ে?

কেউ খুব গরীবের বাড়ির ছেলেমেয়েও না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, সুপ্রকাশের বাবা বাড়ি দোতলা করতে পারেন আর তোমাকে দু'একশ' টাকা বেশি দিতে পারেন না? বলাই'এর মা দু এক মাস অন্তরই সুধীরদার দোকান থেকে গহনা তৈরি করেন, তা জানো?

তুই এসব জানলি কেমন করে?

আমি কী সুধীরদাদের বাড়ি যাই না?

ও একটু থেমে বলে, সুধীরদার দোকানের পাশ দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাবার সময় তো প্রায়ই ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখি। আর সাত্তারদাদের বাড়ি যেতে গেলেই পথে সুপ্রকাশদের বাড়ি . . .

তুই এত খেয়াল করিস?

চোখ-কান থাকলেই তো এসব দেখা যায়, জানা যায়।

আমি একটু চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করি, পরিতোষ বা রেখাও কী বড়লোকের বাড়ির ছেলেমেয়ে?

পরিতোষ যে অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের ছেলে, তা আমি জানি কিন্তু রেখারা ভাঙাচোরা পুরনো বাড়িতে থাকলেও ওদের খাওয়া-পরা চালচলন দেখলে মোটেই মনে হয় না, ওদের টাকাকড়ির অভাব আছে।

চাঁপা একটু থেমে বলে, তুমি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কি নেবে বা না নেবে সে তোমার ব্যাপার। আমার শুধু একটাই কথা—তুমি এত পরিশ্রম করবে না।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, এক নাগাড়ে, তিন-চার ঘণ্টা বক বক করে ছেলেমেয়ে পড়ানো, সহজ ব্যাপার! এভাবে পরিশ্রম করলে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আমি এসব কথার জবাব না দিয়ে বলি, শুধু বক বক করবি নাকি খেতে দিবি?

হ্যাঁ, চল; আমারও বড্ড খিদে পেয়েছে।

মা মারা যাবার দিন শ্মশান ঘাটে বসেই বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে দু'তিনটে সিগারেট খেয়েছিলাম। তার আগে আমি কদাচিৎ কখনও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে এক-আধটা সিগারেট খেতাম কিন্তু মা মারা যাবার পর থেকে আমি রোজই দশ-পনেরোটা সিগারেট খাই। তবে হ্যাঁ, ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার সময় কখনই সিগারেট খাই না। দুপুরে বা রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুটো করে সিগারেট না খেলে ভালই লাগে না। যেদিন দুপুরে ঘুমোই না কিন্তু সন্ধের পর ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি, সেদিন হয়তো দ্বিতীয় সিগারেটটা খেতে-খেতেই ঘুমিয়ে পড়ি। চাঁপা যে কি করে তা জানতে পারে, ভেবে পাই না।

সকালবেলায় চা খেতে খেতে প্রায় আস্ত সিগারেটটা দেখেই ওকে জিজ্ঞেস করি, কাল রাত্তিরে বোধহয় আমি সিগারেট খেতে-খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,

তাই না?

চাঁপা কৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এখন খেয়াল হল?

ও একটু থেমে বলে, কাল তুমি এত ক্লান্ত ছিলে যে সিগারেট খেতে-খেতেই ঘুমিয়ে পড়বে, তা আমি আগেই জানতাম। তাইতো বড়মা'র ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে আলো নিভিয়ে দেবার আগেই তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।

চাঁপা এবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, আচ্ছা আমি যদি বড়মা'র মত কাল ভোরে মরে পড়ে থাকি, তাহলে তুমি কী করবে?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আমি বলি, নিবারণকাকা আর মা'র পর যদি তুইও চলে যাস, তাহলে আমার সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা থাকবে না।

হ্যাঁ, সত্যিই তোমাকে সন্ন্যাসী হতে হবে।

রোজ রাতে শোবার পর আমি অন্তত ঘণ্টা খানেক বইপত্তর না পড়ে ঘুমুতে পারি না। ঘুম এলেই আমি বইখানা টেবিলের উপর রেখে জলের গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বড় আলো অফ্ করে নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু সপ্তাহে দু'একদিন আমি বই পড়তে-পড়তেই ঘুমিয়ে পড়বই। ঠিক মা'র মত চাঁপাও ঘুমুতে যাবার ঠিক আগে আমার ঘরে আসবেই। ও বইপত্তর টেবিলের উপর রেখে বড় আলো অফ্ করে ছোট্ট নীল আলো জ্বালিয়ে দেবার পরই শুতে যাবে।

শুধু কী তাই?

বর্ষা বাদলের দিনেও শোবার সময় বেশ গরম লাগে বলে ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে রাখি কিন্তু দু'এক ঘণ্টা পর ঠাণ্ডা লাগলেও আমি অঘোরেই ঘুমিয়ে থাকি। মা'র মত চাঁপাও ঠিক মাঝরাত্তিরে আমার ঘরে এসে পাখার স্পীড কমিয়ে দেবে বা একেবারেই অফ্ করবে, আমার গায় চাদর দেবে। হয়তো দু'একটা জানলাও বন্ধ করে দেবে।

ছোটজ্যেঠুর সঙ্গে চাঁপা চলে যাবার পর শুধু এইসব মনে পড়ে। এমন কি ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে-পড়াতেও অন্যমনস্ক হয়ে যাই। ওর সেবা-যত্ন-ভালবাসায় এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে এখন প্রতি মুহূর্তে ওর অনুপস্থিতি অসহ্য মনে হচ্ছে।

সেদিন ছোটজ্যেঠুকে যাবার কথা বলার কিছুক্ষণ পর চাঁপা আমার ঘরে এসেছিল কিন্তু কিছু না বলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

কী রে চাঁপা, কিছু বলবি?

ও মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই আবার মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরে ও বলে, ছোটমা'র অবস্থা শুনে খুব খারাপ লাগল বলেই দুম করে যাবার কথাটা বলে ফেললাম।

যাবার কথা বলে তুই তো ভালই করেছিস। তুই গেলে ছোটমা'র কত উপকার হবে বল তো!

তা আমি জানি কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস না করে এভাবে যাবার কথা বলা আমার ঠিক হয়নি।

আমি বোধহয় জোর করেই একটু হেসে বলি, ছোটমা'র কাছে যাবার জন্য আমাকে আবার কী জিজ্ঞেস করবি? ছোটজ্যেঠু বা ছোটমা কী আমাদের পর?

না, তা না কিন্তু তবু তোমাকে আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তাছাড়া আমি চলে গেলে তোমার কী হবে?

আমি আবার জোর করে একটু হেসে বলি, আমার জন্য তুই কিচ্ছু ভাবিস না। এত বন্ধুবান্ধব থাকতে আমার কী চিন্তা?

চাঁপা মাথা নেড়ে বলে, না, না, ওদের দ্বারা সবকিছু কখনই সম্ভব না। ওরা তোমার দু'বেলা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে কিন্তু মাঝরাত্তিরে তো বাড়ি থেকে এসে তোমার গায় চাদর দিতে পারবে না।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া মিটে যাবার পর ছোটজ্যেঠুকে শুইয়ে দিয়ে চাঁপা আমার ঘরে এসে আলমারি গোছাতে বসল।

মানিকদা, এদিকে তাকাও।

আমি দৃষ্টি ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও বলে যায়, এই হ্যাঙ্গারে ঝোলানো পাঞ্জাবি, প্যাণ্ট আর বুশ সার্টগুলো আগে পরবে। আর এখানে তোমার পায়জামাগুলো আছে।

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

আবার একটু পরেই ও বলে, মানিকদা, এই তাকে তোমার ধুতি-পাঞ্জাবি রইল। আর এই নীচের তাকে তোমার আণ্ডারওয়্যার গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, রুমাল থাকল।

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে, মনে থাকবে তো? ভুলে যাবে না?

আমি শুধু একটু হাসি।

আবার পাঁচ-দশ মিনিট পর চাঁপা বলে, মানিকদা,এবার ভাল করে দেখো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখছি।

লকারের ঠিক সামনেই যে টফির বাক্সটা দেখছ তার মধ্যে এ মাসের খরচ-

পত্তরের টাকা রইল। আর এই চামড়ার ব্যাগের মধ্যে যে বারো শ' টাকা রইল, তা দরকারমত খরচ করো। আর হ্যাঁ, এই যে মোটা বড় খামটা দেখছ, এর মধ্যে তোমার ব্যাঙ্কের চেক বই-পাস বই আছে। খামটা একেবারে পিছন দিকে রেখে দিচ্ছি, বুঝলে?

আমি মাথা নাড়ি।

বড়মা'র বাক্সের চাবিও এই লকারের মধ্যেই থাকল।

হ্যাঁ, থাক।

ঠিক মন না লাগলেও আমি আবার বই পড়তে শুরু করি কিন্তু কয়েক মিনিট পরই চাঁপা বলে, মানিকদা, এদিকে তাকাও।

আমি বই থেকে মুখ তুলে পাশ ফিরে তাকাতেই ও বলে, এই যে আলনার উপরের দিকে বাড়িতে পরার পায়জামা-পাঞ্জাবি আর নীচের দিকে গেঞ্জি-আণ্ডারওয়্যার থাকল।

আমি মুখ ঘুরিয়ে নিতেই ও বলে, হ্যাঁ, আর একটা কথা।

হ্যাঁ, বল।

বাবুলাল শনিবার আর মঙ্গলবার আসবে। সব ময়লা কাপড়-চোপড়-বিছানার চাদর ওকে দিয়ে দেবে। তোমাকে কিচ্ছু কাচতে হবে না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, বিছানার চাদর-বেডকভার আলমারির একেবারে নীচের তাকে থাকে, তা জানো তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি।

পরের দিন সকালে যথারীতি ছেলেরা পড়তে এলো কিন্তু কি জানি কেন, ওদের পড়াতে ইচ্ছে করল না। ওদের দু'তিনটে প্রশ্ন লিখতে দিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম।

ওরা চলে যাবার দু'তিন মিনিটের মধ্যেই চাঁপা এসে বলল, নাও, দুধ খেয়ে নাও।

দুধ খাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকলেও কোনও কথা না বলে খেয়ে নিলাম।

বাড়ির ভিতরে যেতেই ছোটজ্যেঠু বললেন, মানিক, আমি ভাবছি এগারটা-সাড়ে এগারটার মধ্যে রওনা হবো। তা না হলে হয়তো সন্ধের আগে পৌঁছতেই পারবো না।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই ভাল।

চাঁপাকে ডেকে বললাম, তোদের এগারটা-সাড়ে এগারটার মধ্যেই রওনা হতে হবে। আমার খাবার ঢেকে রেখে তুই আর ছোটজ্যেঠু একটু পরেই খেয়ে

নে।

চাঁপা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এখন খাবে না?

না; আমি কী এত তাড়াতাড়ি খাই?

চাঁপা আর কোনও কথা না বলে চলে গেল।

ওরা রওনা হওয়ার একটু আগে চাঁপাকে আমার ঘরে ডেকে ওর হাতে পাঁচশ' টাকা দিয়ে বললাম, এটা রেখে দে। দরকারমত ওখানে খরচ করিস।

ও অবাক হয়ে বলে, এত টাকা নিয়ে আমি কি করবো? না, না, আমাকে এত টাকা দিও না।

ছোটজ্যেঠু এখন চাকরি করেন না। তাছাড়া ছোটমা অসুস্থ। কখন কি দরকার হয়, তার কি ঠিক আছে?

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বললাম, তোর ফিরে আসার জন্যও তো টাকাকড়ি দরকার হবে।

চাঁপা কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমাকে প্রণাম করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল, মানিকদা, আমার বাবা নেই, মা নেই, বড়মাও নেই। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে বেশি দিন থাকতে পারবো না।

আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, না, না, তোকে বেশি দিন থাকতে হবে না। ছোটমা একটু ভাল হলেই তুই চলে আসবি।

ছয়

চাঁপার চলে যাবার খবর শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। সব বন্ধুবান্ধবই এক কথা বলল, বিয়ে তো করলি না। এখন তোকে কে দেখবে?

আমি হাসতে হাসতে বলি, কেন, তোরা তো আছিস।

একটু থেমে বলি, এখন থেকে যখন-তখন তোদের এক-একজনের বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসব।

পবিত্র গম্ভীর হয়ে বলল, দ্যাখ, প্রত্যেক দিন দু'বেলা অন্য কোনও বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসা কারুর পক্ষেই সম্ভব না।

সুধীর বলল, ঠিক বলেছিস।

পবিত্র বলে যায়, তর্কের খাতিরে না হয় দু'বেলা খাবার কথা ছেড়েই দিলাম। তোর চা, জলখাবার, বাড়ি-ঘরদোর ইত্যাদি বাকি সব কে সামলাবে?

আমি বললাম, অখিলের মা'কে বলেছি, একটা লোক ঠিক করে দিতে।

সুধীর একটু হেসে বলল, একটা কেন, দশটা লোক রাখলেও চাঁপার মত সুন্দরভাবে ওরা সংসার চালাতে পারবে না।

ও একটু থেমে বলে, মাইনে-করা লোকজনদের কাছে কী চাঁপার মত আন্তরিকতা পাবি?

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর সাত্তার বলল, অসম্ভব! অকল্পনীয়! চাঁপার মত মেয়ে হাজারে একটা হয় না।

পবিত্র সাত্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, হাজারে একটা কেন, আমি অন্তত চাঁপার মত মেয়ে আর দেখিনি।

সুধীর আর সাত্তার প্রায় একসঙ্গেই বলে, সত্যিই তাই।

ওরা আরো কত কি বলল। আমি চুপ করে ওদের সব কথা শোনার পর বললাম, আমি জানি, চাঁপা কত ভাল। ওর কর্তব্যজ্ঞান, আন্তরিকতা বা ভালবাসার কোনও তুলনা হয় না কিন্তু ও তো সারাজীবন ধরে আমার সেবা-যত্ন করবে না। দু'এক বছরের মধ্যেই ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাত্তার একটু হেসে বলল, ওর উপযুক্ত ছেলে পাওয়া কী সহজ ব্যাপার? ওকে তো যার-তার হাতে তুলে দিতে পারবি না।

পবিত্র বলল, চাঁপার উপযুক্ত ভদ্র-সভ্য-শিক্ষিত ছেলে পাওয়া সত্যি সহজ না।

আমি বললাম, সহজ যে না, তা আমিও জানি কিন্তু সারাজীবন দাসীবৃত্তি করার জন্য তো আমি ওকে ধরে রাখতে পারবো না।

চাঁপা যা রান্না করে রেখেছিল, সেইসব খেয়েই ঐদিন দু'বেলা কেটে গেল।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল দরজা ধাক্কাধাক্কির আওয়াজ শুনে। দরজা খুলেই দেখি, অখিলের ছোট বোন শীলা।

ও আমার পিছন পিছন ঘরে এসে আমার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে বলল, মা বললেন, সকালবেলার ছাত্ররা চলে যাবার পরই জলখাবার পাঠিয়ে দেবেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলি, শীলা, তুই মাসিমাকে বলিস, খাবারদাবার কিছু পাঠাতে হবে না।

ও একটু হেসে বলল, পাঠাতে হবে না বললেই মা শুনবে নাকি?

পৌনে ছ'টা নাগাদ আমি বাথরুম থেকে বেরুবার পর পরই শীলা আবার চা নিয়ে হাজির।

শোন শীলা, মাসিমাকে বলবি, মাঝে-মধ্যে চা পাঠিয়ে দিতে। আর কিছু

পাঠাতে হবে না।

সাড়ে ন'টা নাগাদ মাসিমা নিজেই আমার জন্য খান কয়েক পরোটা আর তরকারী নিয়ে এলেন।

বললাম, মাসিমা, আপনি যখন নিয়ে এসেছেন, তখন এসব নিশ্চয়ই খাবো কিন্তু কাল থেকে আর পাঠাবেন না।

তোমার জন্য তো আলাদা করে কিছু করতে হচ্ছে না। বাড়ির আর পাঁচজনের জন্য যা হচ্ছে, তার থেকেই তোমাকে একটু কিছু দিলে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ঠিক পাশের বাড়িতে থেকে তোমার জন্য এটুকু না করলে কী শান্তিতে ঘুমুতে পারবো?

একথার কী জবাব দেব? আমি চুপ করে থাকি।

যাই হোক. মাসিমার দেওয়া পরোটা খেয়ে বৈঠকখানায় বসে সিগারেট খেতে-খেতেই সুধীরের দোকানের সত্য এসে হাজির। আমার হাতে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ দিয়ে বলল, বৌদি এটা পাঠিয়েছেন।

শ্রীপর্ণা লিখেছে, আমি বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ আপনার খাবার নিয়ে আসব। তখন কথা হবে।

আমি চান করে জামাকাপড় পরে খবরের কাগজের প্রথম পাতার উপর দিয়ে চোখ বুলাতে-না-বুলাতেই শ্রীপর্ণা হাজির।

মানিকদা, চান করেছেন?

হ্যাঁ, বৌদি।

এখনই খাবেন নাকি একটু পরে?

আমি একটু হেসে বলি, আগে তোমার বিচার করি। তারপর খাবো।

শ্রীপর্ণাও একটু হেসে বলে, কেন খাবার নিয়ে এসেছি, সেই কথা জিজ্ঞেস করবেন তো?

আমি জবাব দেবার আগেই ও বলে, কেন খাবার আনবো না, সেই কথা আপনি বলুন। আপনি কী আমার দাদা না? আমি কী আপনার বোন না? আপনাকে একটু কিছু দেবার অধিকারও কী আমার নেই?

বৌদি, তুমি আমাকে ক্লীন বোল্ড করে দিলে। তবে . . .

আমাকে কথাটা বলতে না দিয়েই শ্রীপর্ণা একটু হেসে বলে, আগে আমার কথা শুনুন। পরে আপনার কথা শুনবো।

হ্যাঁ, বল।

আপনার বন্ধুর কাছ থেকে চাঁপার চলে যাবার খবর শুনেই মা ভীষণ

দুশ্চিন্তায় পড়লেন। আপনার বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন, মা, তোমার বিন্দুমাত্র চিন্তার কারণ নেই। শ্রীপর্ণা বেঁচে থাকতে ওর দাদা খেতে পাবে না, তা কখনই হবে না।

ও একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার শাশুড়ী কী বললেন জানেন?

কী বললেন?

মা বললেন, অমন দাদাকে সেবা-যত্ন করলে বৌমারই কল্যাণ হবে।

আমি একটু হেসে বলি, তোমরা সবাই আমাকে যে কী ভাবো !

আপনি যা, ঠিক তাই ভাবি।

শ্রীপর্ণা অত্যন্ত আদর-যত্ন করে আমাকে খাওয়াবার পর বলল, দাদা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। রোজ দুপুরে আমি আপনাকে খাইয়ে যাবো। রাত্রে আপনার অন্য কোনো বন্ধুর বাড়ি থেকে খাবার আসবে।

কিন্তু . . .

দাদা!

শ্রীপর্ণা শাসন করার ভঙ্গীতে বলে, আপনি আপত্তি করলে আমি ভীষণ দুঃখ পাবো। আপনাকে না খাইয়ে আমি শান্তিতে খেতেও পারবো না।

আমি একটু হেসে বলি, চাঁপা কি বলতো জানো?

কী বলতো দাদা?

বলতো, মানিকদা, বড়মা'র পর শ্রীপর্ণা বৌদিই তোমাকে সব চাইতে ভালবাসে।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে শ্রীপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললাম, চাঁপা ঠিকই বলতো।

শ্রীপর্ণাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, দাদা, আপনাকে কে ভালবাসে না বলুন তো!

বিকেলবেলায় রাবেয়াকে একটা টিফিনবক্স হাতে নিয়ে ঢুকতে দেখেই চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করি, ওহে ভাল মেয়ে, আম্মা আমার জন্য কী পাঠিয়েছেন?

ও একটু হেসে বলে, কয়েকটা কচুরি।

আগামী কাল কী পাঠাবেন?

যা বাড়িতে হবে, তাই পাঠাবেন।

পরশু কী পাঠাবেন? তার পরদিন কী পাঠাবেন?

আমার প্রশ্ন শুনে রাবেয়া একটু জোরেই হেসে ওঠে। তারপর বলে, আপনি

যা খেতে চান, তাই নিয়ে আসবো।

আমি যদি ঘোড়ার ডিমের চপ্ খেতে চাই?

আমার কথা শুনে ও হো হো করে হেসে ওঠে।

রাত্রে খাবার নিয়ে এলেন পবিত্র'র মা নিজে।

অবাক হয়ে বলি, একি মাসিমা, আপনি নিজে কেন এলেন?

তাতে কী হল বাবা?

উনি টিফিন কেরিয়ার নামিয়ে রেখে বলেন, বড় বৌমা সব ঠিকঠাক করে দেবার পর তোমার বন্ধুই আসছিল কিন্তু আমিই ওকে বারণ করলাম।

না, না, মাসিমা, এই রাত্তিরে আপনার এভাবে আসা ঠিক হয়নি।

মাসিমা একটু হেসে বললেন, এই সত্তর-একাত্তর বছরের বুড়ীকে মাঝ-রাত্তিরেও একলা দেখলে কেউ বিরক্ত করবে না।

কিন্তু এতটা পথ হেঁটে তো আসতে হল।

দেখো বাবা, সংসারের কোনো কাজকর্মই তো আমাকে করতে হয় না। সবই দুই বৌমা সামলায়। আমি যদি একটু আধটু হাঁটাচলা না করি, তাহলে তো বাতে পঙ্গু হয়ে যাবো।

এইভাবেই বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল।

রবিবার সকালে যথারীতি পবিত্র, সুধীর আর সাত্তার আমাদের বাড়ি এসে হাজির। কথায় কথায় আমি ওদের বললাম, সামনের মাস থেকে আমি আর কোনো ছাত্রছাত্রী পড়াবো না।

কেন?

ওরা সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করে।

দ্যাখ, মানুষ আয় করে নিজের আর পরিবারের পাঁচজনের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য।

ওরা চুপ করে আমার কথা শোনে।

আমার পরিবারের ঝামেলা নেই। বাড়ি ভাড়া লাগে না। যা জামাকাপড় আছে, তাতে দু'এক বছর বেশ চলে যাবে।

আমি একটু থেমে বলি, তোরা যখন আমার খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিস, তখন শুধু শুধু খাটাখাটনি করে আয় করার দরকার কী?

ওরা আমার কথা শুনে হেসে ওঠে।

তারপর সুধীর বলল, যদি আমাদের সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়?

তাতেও ক্ষতি নেই।

আমি একটু থেমে বলি, তোদের সঙ্গে ঝগড়া হলেও শ্রীপর্ণা, রাবেয়া, আম্মা-মাসিমাদের সঙ্গে তো ঝগড়া হবে না। ওঁরা আমাকে ঠিক সাপ্লাই দিয়ে যাবেন।

পবিত্র আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সময় কাটাবি কী করে? ভজন গেয়ে?

তোদের মোসাহেবী করে।

এইসব গল্পগুজব করার পর আমরা সাত্তারদের বাড়ি খেতে গেলাম।

আমাদের খাওয়াতে-খাওয়াতেই আম্মা বললেন, আজ তোমাদের একটা সুখবর দেব। সামনের মাসের সাতাশে তোমাদের বন্ধুর বিয়ে।

খবর শুনেই আমরা হৈ হৈ করে উঠলাম।

সুধীর জিজ্ঞেস করল, আম্মা, ভাগ্যবতীটি কে?

আম্মা জবাব দেবার আগেই রাবেয়া বলল, আমাদের ভাবীও ডাক্তার।

ও রিয়েলি!

সাত্তার চুপ করে থাকলেও আমরা আনন্দে উত্তেজনায় ফেটে পড়ি।

আম্মা বলেন, বছর তিনেক আগে বর্ধমানে আমার এক চাচার নাতনীর বিয়েতে গিয়ে এই মেয়েটিকে দেখেই আমার খুব পছন্দ হয় কিন্তু শুনলাম, ও ডাক্তারী পাস না করে বিয়ে করবে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটি কী গতবারই পাস করেছে?

না, না, এইবারই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ থেকে . . .

আম্মা, ওর নাম কী?

আয়েষা।

আমরা খেয়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে যেতেই রাবেয়া হাসতে হাসতে আমাদের সামনে একটা ছবি ধরে বলল, এই দেখুন ভাবীর ছবি।

ছবি দেখে আমাদের সবারই ভাল লাগলো।

রাবেয়া বলল, জানেন মানিকদা, ভাবী খুব সুন্দর গান গাইতে পারে।

সুধীর উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এখুনি বর্ধমান যাচ্ছি। তোরা কেউ আমার সঙ্গে যাবি?

রাবেয়া বলল, সুধীরদা, আমি যাবো।

ঠিক সেই সময় আম্মা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবি?

সুধীরদার সঙ্গে বর্ধমান যাবো।

আম্মা বললেন, সুধীর, আজকে না গিয়ে সামনের রবিবার তোমরা সবাই মিলে যাও। আমি ওদের বাড়িতে খবর দিয়ে দেব।

পবিত্র বলল, হ্যাঁ, আম্মা, সামনের রবিবারই আমরা যাবো। সাত্তারকে সঙ্গে

নিয়ে গিলে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

না, না, আপত্তির কী আছে?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যাকে নিয়ে সারা জীবন ঘর করবে, তার সঙ্গে দেখাশুনা হলে আপত্তি করবো কেন?

পবিত্র বলে, ঠিক বলেছেন আম্মা।

ক'দিন পরই ছোটজ্যেঠুর পোস্টকার্ড পেলাম। . . .

স্নেহের বাবা মানিক, সেদিন তোমাদের ওখান থেকে রওনা হইয়া আমি আর চাঁপা মা ভালভাবেই এখানে আসিয়াছি। তোমার ছোটমা'র শরীর খুবই খারাপ। তবে চাঁপা মা এখানে আসিয়াই সংসারের সব দায়িত্ব পালন করিয়াও যেভাবে উহার সেবা-যত্ন করিতেছে, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই। চাঁপা মা'কে কাছে পাইয়া তোমার ছোটমা যে খুশি হইয়াছেন, তাহা বলিবার নহে। তুমি অবশ্যই নিজের শরীরের প্রতি যত্ন লইবে। আশীর্বাদ জানিও। . . .

পরের রবিবার নকুলের গাড়ি ভাড়া করে, আমি, পবিত্র, সুধীর, শ্রীপর্ণা আর সাত্তার বর্ধমান গেলাম।

আয়েষাদের পরিবারটি যেমন ভদ্র তেমনি শিক্ষিত। আয়েষার বাবা বার্ণপুর ইসকো হাসপাতালের সার্জেন। ওর এক কাকা কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক, অন্য কাকা ভিলাই স্টীল প্ল্যাণ্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। অধ্যাপক কাকার ছেলে যাদবপুরে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়ছে; মেয়ে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ব্রেবোর্নে পড়ছে। ভিলাই-এর কাকার মেয়ে নাগপুর ডেণ্টাল কলেজে পড়ছে। আয়েষার দাদু এককালে বর্ধমানের বেশ নাম-করা উকিল ছিলেন। শুনলাম, পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত কোর্টে যেতেন। এখন বিরাশী বছর বয়স হলেও বেশ ভালই আছেন। তাছাড়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সুরসিক।

আমরা বললাম, আপনি যে এই বয়সেও এত হাসি-খুশি এত প্রাণবন্ত আছেন, তা দেখে খুবই ভাল লাগল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, দ্য ক্রেডিট গোজ্ টু মাই বিলাভেড গার্ল-ফ্রেণ্ড!

তারপর তির্যক দৃষ্টিতে একবার আয়েষাকে দেখে নিয়ে চাপা হাসি হেসে বললেন, এই পরমা সুন্দরী প্রিয়বান্ধবী গত পঁচিশ বছরে আমাকে অন্তত পঁচিশ হাজার বার চুমু খেয়েছে আর পঁচিশ হাজার বার জড়িয়ে ধরেছে বলেই তো এখনও মুখের হাসি ধরে রেখেছি।

আয়েষাও সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বৃদ্ধকে বলল, ডার্লিং, প্লীজ ডোণ্ট ডিসক্লোজ এভরিথিং টু আউট-সাইডার্স!

সব মিলিয়ে বড় ভাল লাগল আয়েষাকে।

বর্ধমান থেকে আমাদের গাড়ি ছাড়তে-না-ছাড়তেই শ্রীপর্ণা বলল, সাত্তারদা, আয়েষা শুধু আপনাকে সুখী করবে না, ও আমাদের সবাইকেই সুখী করবে।

আমি বললাম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

পবিত্র বলল, তবে সাত্তার, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। শ্রীপর্ণার মত তোর বউও যদি মানিকদা বলতে অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে ভাল হবে না।

আমরা হেসে উঠলেও পবিত্র সাত্তারের দুটো হাত চেপে ধরে বলে, প্লীজ, তুই প্রথম দিন থেকেই আয়েষাকে বলবি, পবিত্র ঠিক যীশুর মত দরদী, বুদ্ধের মত সর্বত্যাগী আর পয়গম্বরের মতই উদার!

আমাদের হাসাহাসির মধ্যেই শ্রীপর্ণা বলে, পবিত্রদা, আপনি যে এত হিংসুটে তা তো জানতাম না।

না হিংসুটে হয়ে উপায় আছে? দুনিয়ার যত ভাল ভাল খাবার তুমি মানিককে খাওয়াবে আর আমি যখনই যাবো, তখনই আমাকে শুধু ঐ গাঁজাখোর হরিপদর দোকানের পচা সিঙ্গাড়া খেতে হবে।

সুধীর কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বলল, সাত্তার, এই সর্বত্যাগী বুদ্ধের কথা তোর বউকে ভাল করে বলে দিস।

সারাটা দিন বড় আনন্দে কেটে গেল।

পরের দিন চাঁপার চিঠি এলো। . . .

এখানে আসার পরই তোমাকে চিঠি লেখা উচিত ছিল কিন্তু ভোর সাড়ে পাঁচটা-ছ'টায় উঠে রাত সাড়ে এগারোটা-বারোটায় শুতে যাবার সময় পর্যন্ত কিভাবে যে সময় কেটে যায়, তা বলতে পারবো না। বাত যে কি ভয়ঙ্কর অসুখ, তা ছোটমা'কে দেখার আগে আমি ভাবতে পারিনি। বাথরুমে গিয়ে চান-টান করা তো দূরের কথা, দু'হাত দিয়ে ধরেও এক গেলাস জল খেতে পারেন না। আমাদের কাটোয়ার বাড়ির মত এখানে বাসন মাজা বা ঘরদোর পরিষ্কার করার কোনও লোক নেই। তাইতো সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম আমাকেই করতে হয়। এই কাজকর্ম ছাড়াও দু' পাঁচ মিনিট অন্তরই ছোটমা'র কাছে যেতে হয়। এইসব কারণেই এতদিন তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি। আশা করি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

এবার একটা জরুরী কথা লিখি। ছোটমা'র ডাক্তার বলেছেন, কলকাতার এক হাসপাতাল থেকে এক ভদ্রলোক এখানে প্রতি শনি-রবিবার আসেন। তিনি যদি ছোটমা'কে মালিশ ও বিশেষ ধরনের কিছু ব্যায়াম করিয়ে দেন, তাহলে ভাল হবে। শুনলাম, এর জন্য ঐ ভদ্রলোককে দৈনিক ৫০্ টাকা হিসাবে মাসে ৪০০্ টাকা দিতে হবে কিন্তু শুধু টাকার অভাবে ছোটজ্যেঠু কিছু করতে পারছেন না। আমার মনে হয় তুমি অবিলম্বে ছোটমা'র চিকিৎসা বাবদ ৪/৫শ' টাকা পাঠাও এবং ঐ টাকা তোমাকে প্রতি মাসেই পাঠাতে হবে। তবে আমি যে তোমাকে কিছু লিখেছি, তা ছোটজ্যেঠুকে জানাবে না।

শুনলাম, রাধাদি জামসেদপুরের একটা স্কুলে চাকরি করছে। জামাইবাবুও নাকি ব্যবসা করে ভালই আয় করেন কিন্তু ছোটমা'র চিকিৎসার জন্য ওরা নিয়মিত কিছুই পাঠায় না। তিন-চার মাস অন্তর হঠাৎ রাধাদির কাছ থেকে দু'এক শ' টাকার মনি অর্ডার আসে।

আমি চলে আসার পর তোমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমাকে দেখাশুনা করছে কিন্তু তবুও তুমি যে ভাল নেই, তা আমি খুব ভাল করেই জানি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও সব সময় শুধু কাটোয়ার বাড়ির কথা আর তোমার কথা মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি কাটোয়ার বাড়ি আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে একটু ভাল লাগছে না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা'কে ফেলে যাবার কথাও ভাবতে পারছি না। ছোট-মা একটু ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি কাটোয়ায় ফিরতে পারবো না।

যাই হোক, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করো। সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়বে না। সকালে চান করার পর ও রাত্রে শুতে যাবার আগে জ্যেঠু-বড়মা'র ঘরে কয়েকটা করে ধূপকাঠি অবশ্যই জ্বালিয়ে দিও। . . .

চিঠিটা পড়া শেষ করতে-না-করতেই শ্রীপর্ণা টিফিন কেরিয়ার হাতে নিয়ে বারান্দায় উঠেই জিজ্ঞেস করল, দাদা, ছোটজ্যেঠুর চিঠি?

না, চাঁপার।

চিঠিখানা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, পড়ে দেখ।

আপনার চিঠি আমি পড়ব?

কেন পড়বে না?

চিঠিখানা মন দিয়ে পড়েই শ্রীপর্ণা একটু হেসে বলল, বাঃ! খুব সুন্দর চিঠি।

হ্যাঁ, বেশ গুছিয়ে সুন্দর চিঠি লিখেছে।

শ্রীপর্ণা আমাকে খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, দাদা, আপনার কী মনে হয় ছোট-মা দু'এক মাসের মধ্যে একটু সুস্থ হয়ে উঠবেন?

ছোটজ্যেঠুর কাছে যা শুনেছি বা চাঁপার এই চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, দু'এক

মাস তো দূরের কথা, দু'এক বছরের মধ্যেও ছোটমা ভাল হবেন কিনা সন্দেহ।

তার মানে চাঁপাও নিকট-ভবিষ্যতে ফিরতে পারছে না।

মাথা নেড়ে বললাম, না।

সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে বললাম, আমার জন্য তোমার দুর্ভোগ বেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই মনে হয়।

কি যে বলেন দাদা!

পরের দিনই ছোটমা'র চিকিৎসার জন্য ছোটজ্যেঠুকে পাঁচ শ' টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম।

টাকাটা পেয়েই উনি লিখলেন, তোমার টাকাটা পাইয়া যে কি উপকার হইল, তাহা বলিবার নয়। তুমি প্রতি মাসে পাঁচ শত টাকা পাঠাইবে বলিয়া তোমার ছোটমা'র ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করিয়াছি। আশা করি ইহার দ্বারা তোমার ছোটমা'র কিছু উন্নতি হইবে।... চাঁপা মা এক হাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছোটমা'র সবকিছু সামলাইতেছে।...

যাই হোক এইভাবেই মাসের পর মাস কেটে যায়।

এর মধ্যে আমি অনেকটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছি। ভোরবেলায় উঠে নিজেই চা করি। দু'কাপ ফ্ল্যাস্কে রেখে দু'কাপ চা পর পর খাই। ব্রেকফাস্টও নিজে তৈরি করি। অবশ্য শুধু টোস্ট আর ওমলেট। আর কিছু না। শ্রীপর্ণাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাবার পর এখন সুধীরের কোনো কর্মচারী টিফিন কেরিয়ারটা পৌঁছে দিয়ে যায়। সারাদিন বাড়িতে একলা থাকার পর একটু বাইরে যাবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করে। তাইতো এখন আমি নিজেই বন্ধুদের বাড়ি রাত্রে খেতে যাই। এখন রবিবার দুপুরে আমার এখানেই নিয়মিত একটা ছোটখাটো পিকনিক হয়। তবে রান্নাবান্নার ব্যাপারে শ্রীপর্ণা আর আয়েষা আমাদের নাক গলাতে দেয় না।

রবিবার সারা দিন ধরেই আমরা খুব আনন্দ করি। খাওয়া দাওয়া গল্পগুজবের মধ্যেই হঠাৎ আয়েষা দু'একটা গান শুনিয়ে দেয়।

প্রত্যেক রবিবারই দুপুরের রান্না বেশি হয়। শ্রীপর্ণা তার থেকেই আমার রাত্রের খাবার ঠিকঠাক করে রেখে দিয়ে বলে, দাদা, খাবার আগে ডাল আর মাংস একটু গরম করে নেবেন।

অনেক দিন পর চাঁপার চিঠি এলো।...

তুমি ছোটমা'কে দেখে চলে যাবার পর থেকেই ছোটজ্যেঠু মাঝে মাঝেই বলতেন, শরীরটা বিশেষ ভাল নেই কিন্তু কিছুতেই ডাক্তার দেখাতেন না। সামান্য কাজকর্ম করলেই ছোটজ্যেঠু ভীষণ হাঁপিয়ে উঠতেন। যাই হোক, এইভাবেই তিন মাস কেটে গেল।

গত শুক্রবার রাত্রিবেলায় হঠাৎ রাধাদি জামাইবাবুকে নিয়ে এখানে হাজির। ঘরে সামান্য যা কিছু ছিল, তাই রান্নাবান্না করে ওদের খেতে দিলাম। পরের দিন সকালে উঠে ছোটজ্যেঠু বাজার করতে গেলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর বাজারের দুটো লোক এসে আমাদের খবর দিল, উনি বাজারের মধ্যেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান বলে বাজারের লোকজনই ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। সেদিন রাত ৮টা ১০ মিনিটে ছোটজ্যেঠু মারা যান।

এদিকে জামাইবাবু আর রাধাদি ঠিক করেছে, আগামী কাল ছোটমা আর আমাকে নিয়ে জামসেদপুর যাবে। ওখানে যেতে আমার বিশেষ ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়েই যেতে হবে। জামাইবাবু আমাকে বললেন, তুই মা'কে দেখাশুনা করবি। আমি তোকে ভাল মাইনে দেব। উনি বোধহয় ভেবেছেন আমি টাকার লোভে ছোটমা'র দেখাশুনা করছি। তাছাড়া রাধাদিকেও আমার ভাল লাগেনি। উনি যেন সব সময় রেগে আছেন। কখনই কারুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলেন না। তাছাড়া যেভাবে উনি ছোটজ্যেঠুর কাজ করলেন, তা দেখে অবাক হয়ে গেছি।

যাই হোক, আগামী কাল জামসেদপুর যাচ্ছি। জানি না ওখানে কি পরিস্থিতিতে পড়বো। সুযোগ-সুবিধে মত নিশ্চয়ই চিঠি দেব। মোটকথা, আমার মন খুব খারাপ। এই সময় তুমি বা তোমার কোনো বন্ধুকে পেলে আমি এই মুহূর্তে কাটোয়া চলে যেতাম।

ব্যাস! তারপর চাঁপার আর কোন চিঠি নেই। ওখানে গিয়ে হয়তো ওর কাজের চাপ বেড়েছে; ছোটমা'র শরীর হয়তো আরো খারাপ হয়েছে কিন্তু তাই বলে তিন মাসের মধ্যে একটা পোস্টকার্ড লেখারও সময় হল না?

না, না, তা হতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হয়, ও যদি চিঠি লিখেই থাকে, তাহলে সে চিঠি এলো না কেন?

এদিকে রাধাদের ঠিকানা জানি না বলে আমিও চিঠি দিতে পারছি না।

সব মিলিয়ে বড়ই অস্বস্তি বোধ করি।

চাঁপার একটা চিঠির আশায় মাসের পর মাস বসে থাকি। ঘুরে গেল একটি না, পুরো দুটি বছর।

শুধু আমি না, বন্ধুবান্ধবরাও বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে।

চাঁপা কী বেঁচে নেই? নাকি সত্যি কোনো অঘটন ঘটেছে?

সাত

ইদানীং চাঁপার কথা ভাবতে গিয়েই ছোটজ্যেঠুদেরও নানা কথা মনে পড়ে।

আমার শোবার ঘরের পিছন দিকের যে সরু গলিটা হেলেদুলে এঁকে-বেঁকে যুবক সমিতির মাঠের দিকে চলে গেছে, সেই গলিরই মাঝামাঝি বলাই দত্তদের পাশাপাশি দু'খানা বাড়ি আছে। ওরই একটা বাড়িতে ছোটজ্যেঠুরা থাকতেন।

বলাই দত্ত কখনও একলা, কখনও সপরিবারে বছরে এক-আধবার এখানে আসতেন কিন্তু রাত কাটাতেন না। ওঁরা সকালে এসে বিকেলেই ফিরে যেতেন। সবসময় ওঁরা মোটরে আসতেন কিন্তু এখানে পৌঁছোবার পর বলাই দত্ত কখনই মোটরে চড়ে শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন না। কাছাকাছি এর-ওর বাড়িতে হেঁটেই যেতেন আর দূরে যেতে হলে সবসময় বুড়ো যোগেনের রিকসায় যেতেন।

ছোটবেলায় আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, যাঁর মোটর আছে, তিনি কেন রিকসা চড়েন? তাও আবার ঐ বুড়ো যোগেনের রিকসায়?

তারপর একদিন মা-কে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মা, বলাই জ্যেঠু এখানে এলেই মোটরে না চড়ে ঐ বুড়ো যোগেনের রিকসায় ঘুরে বেড়ান কেন?

মা একগাল হাসি হেসে বলেছিলেন, যোগেন যে তোর বলাই জ্যেঠুর বন্ধু।

বন্ধু?

একটু থেমে আমি বলি, বলাই জ্যেঠু তো মস্ত বড়লোক। রিকসাওয়ালা যোগেন কী ওর বন্ধু হতে পারে?

মা চাপা হাসি হাসতে হাসতে জবাব দেন, হ্যাঁ, সত্যি ওরা বন্ধু। তোর জ্যেঠু আর যোগেন তো ছোটবেলায় একসঙ্গে পড়তো, খেলতো।

উনি একটু থেমে বলেন, তুই যখন খুব ছোট, তখন ভীষণ বন্যা হয়েছিল। সেবার ঐ বন্যায় এই শহরের বহু কাঁচা বাড়ি ভেঙে-চুরে বা গঙ্গায় ভেসে যায়। যোগেনদের বাড়িও ঐ বন্যায় ভেঙে পড়ে। তারপর তোর ঐ জ্যেঠুই তো যোগেনের বাড়ি পাকা করে দেয়।

বলাই জ্যেঠু এত ভাল লোক?

হ্যাঁ, সত্যি উনি খুব ভাল মানুষ। উনি যে পুরনো দিনের কথা ভুলে যাননি, তা দেখে আমি ওঁকে শ্রদ্ধা না করে পারি না।

পুরনো দিনের কথা মানে?

সে অনেক কথা। পরে একদিন তোকে সব বলব।

হ্যাঁ, পরে একদিন মা আমাকে সব কথা বলেছিলেন.

তোর দাদু যে সংস্কৃত সাহিত্যে মহাপণ্ডিত ছিলেন, সেকথা সবাই জানে। স্বয়ং স্যার আশুতোষ মুখার্জী যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার জন্য অত্যন্ত স্নেহ করতেন, সেকথাও বহু লোকেই জানে কিন্তু তোর ঠাকুমাও যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন, তা বিশেষ কেউই জানে না।

ঠাকুমা যে বড় জ্যোতিষী ছিলেন, তা তো আমিই আজ প্রথম শুনছি।

মা একটু হেসে বলেন, তুই তো সেদিন হয়েছিস! তুই জানবি কী করে?

কিন্তু ঠাকুমা জ্যোতিষশাস্ত্র পড়লেন কোথায়?

মা একটু হেসে বললেন, তুই ভুলে যাচ্ছিস, তোর ঠাকুমার বাবা মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। উনি সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত পড়ালেও জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কখনই জ্যোতিষ চর্চা করতেন না। তাইতো উনি তোর ঠাকুমার প্রথম বিয়ের আগে ওঁর ঠিকুজি-কোষ্ঠীর বিচার পর্যন্ত করেননি বা করতে দেননি।

আমি একমনে মা'র কথা শুনি।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু বিয়ের তিন মাসের মধ্যে মেয়ে বিধবা হবার পরই উনি ওঁর ঠিকুজি-কোষ্ঠী তৈরি করে বিচার-বিবেচনা করলেন আর মেয়েকেও জ্যোতিষশাস্ত্র পড়াতে শুরু করলেন।

মা একটু থেমে বললেন, তোর ঠাকুমাই আমাকে বলেছেন, তোর দাদুর সঙ্গে ওর বিয়ের আগে উনি আর ওর বাবা দু'জনে মিলে ঠিকুজি-কোষ্ঠী বিচার করার পরই এই বিয়ের ব্যাপারে সম্মত হন।

আমি একটু হেসে বলি, ঠাকুমা তো আচ্ছা মেয়ে ছিলেন! নিজের বিয়ের আগে নিজেই নিজের ঠিকুজি বিচার করেছিলেন!

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, আবার কোনো অঘটন বা অশান্তি হবে কিনা জানার জন্যই বাপ-মেয়েতে মিলে ঠিকুজি-কোষ্ঠী বিচার করেছিলেন!

আমি হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করি, বাবার সঙ্গে তোমার বিয়ের আগে ঠাকুমা তোমাদের ঠিকুজি-কোষ্ঠী বিচার করেছিলেন?

না।

কেন?

ওর বাবা ওকে বিশেষ কারণ ছাড়া কারুর ঠিকুজি-কোষ্ঠী বিচার করতে বারণ করেছিলেন।

তার মানে ঠাকুমা কী কারুরই ঠিকুজি-টিকুজি বিচার করেননি?

মা বোধহয় মাত্র দু'চারজনেরই ঠিকুজি-কোষ্ঠী বিচার করেন বলেই জানি।

হঠাৎ ঐ দু'চারজনের জন্য কেন?

মা একটু হেসে বলেন, তোর বলাই জ্যেঠু যে আমাদের এত পছন্দ করেন, ভালবাসেন, তার কারণ তো তোর ঠাকুমা ওঁর ঠিকুজি দেখেছিলেন বলে।

এই যে বললে, ঠাকুমা যার-তার ঠিকুজি দেখতেন না, তাহলে . . . .

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মা বলেন, তোর এই বলাই জ্যেঠুর বাবা একটা মুদিখানার দোকানে চাকরি করতেন কিন্তু সেই সামান্য রোজগার দিয়ে কিছুতেই সংসার চলতো না। অভাব-অনটন আর ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া না করতে পারার জন্য শেষ পর্যন্ত উনি যক্ষ্মা রোগে মারা যান।

মা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, বাবা মারা যাবার পর ছ'জন লোকের সংসারের দায়িত্ব যখন বলাই জ্যেঠুর উপর পড়ল, তখন উনি মাত্র ষোলো বছরের।

মাত্র ষোলো বছরের?

হ্যাঁ।

মা একটু থেমে বলেন, সংসার চালাবার জন্যই তোর জ্যেঠুকে পড়াশুনা ছেড়ে ঐ মুদির দোকানে চাকরি নিতে হলো। . . . .

বলাই জ্যেঠুর তো কোনো ভাই নেই?

না, ভাই নেই কিন্তু তিন বোন আছে। তখন তো এক বিধবা পিসীও ওঁদের সংসারে ছিলেন।

তারপর কী হলো?

ঐ মুদির দোকানে কাজ করে তোর বলাই জ্যেঠু মাত্র দশ টাকা মাইনে পেতেন কিন্তু তাতে তো সংসার চলে না। তোর জ্যেঠুর মা এর-ওর বাড়ির কাঁথা-টাথা সেলাই করে সামান্য দু'পাঁচ টাকা আয় করতেন কিন্তু তাতেও তো অভাব মিটত না।

ওরা এত গরীব ছিলেন?

হ্যাঁ, তখন ওরা সত্যি বড্ড গরীব ছিলেন।

তারপর উনি বড়লোক হলেন কবে?

বলছি। . . .

সেদিন কি যেন একটা ব্রত উপলক্ষে কাত্যায়নী দেবী গঙ্গায় স্নান করতে

গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে হারাধন মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলাইকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখে উনি তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে বলাই. তুই এমন করে কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে তোর?

বলাই তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ; ওর কথার জবাব দিতে পারে না।

এবার কাত্যায়নী দেবী হারাধনকেই জিজ্ঞেস করেন, হ্যাগো. বলাই এমনভাবে কাঁদছে কেন? তোমার কোনো খদ্দের ওকে কিছু বলেছে?

হারাধন অত্যন্ত মেজাজের সঙ্গে জবাব দেয়, না, না. কোনো খদ্দের কিছু বলেনি। আমিই ওকে মেরেছি।

কেন? ওর অপরাধ?

আমাকে না বলেই বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য চাল ওজন করছিল বলে.......

বলাই কাঁদতে কাঁদতে বলে, জানো জ্যেঠিমা, আমি তো বলেই চাল নিতাম কিন্তু দোকান বন্ধ হবার সময় হচ্ছিল বলে শুধু ওজন করে ....

হারাধন গর্জে ওঠে, একি তোর বাপের দোকান যে না বলে-কয়েই চাল ওজন করবি?

কাত্যায়নী দেবীও সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠেন, হারাধন, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো। বলাই চুরি করলে থানা-পুলিশ করতে পারতে কিন্তু ওকে মারার কোনো অধিকার নেই।

হারাধনও হার মানতে চায় না। বলে, আমি আমার কর্মচারীকে কীভাবে শাসন করবো, তা কাউকে বলে দিতে হবে না।

হারাধন, বলাই তোমার দশ টাকা মাইনের কর্মচারী। সে তোমার ক্রীতদাস না।

কাত্যায়নী দেবী শুধু এইটুকু বলেই থামলেন না। বললেন, হারাধন, আমি যদি সৎ ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তাহলে তোমার এই অহংকার আর অন্যায়ের জন্য তোমাকে একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

হারাধনও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে. যে বিধবা হয়ে বিয়ে করে, তার মুখে অন্তত সৎ বামুনের মেয়ে হবার বড়াই মানায় না।

ওর কথা শুনে ক্যাতায়নী দেবী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিস্ময় আর দুঃখে নীরব হয়ে থাকলেও ঐ কিশোর বলাই চীৎকার করে ওঠে, হারাধনকাকা, কি যা-তা বলছেন?

চুপ কর হতচ্ছাড়া! কাল থেকে তোর চোদ্দো পুরুষের জ্যেঠিমা'র কাছেই

চাকরি করিস। আমার এখানে এলে তোকে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেব।

ক্যাত্যায়নী দেবী সঙ্গে সঙ্গে বলাইকে নিয়ে ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মা'কে বললেন, দ্যাখ সরলা, তোরা না খেয়ে মরে গেলেও এই ছেলেটাকে ঐ অসভ্য জানোয়ারটার দোকানে গোলামি করতে পাঠাবি না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার ঘরে যতদিন ধান-চাল আছে, তোকে কারোর কাছে হাত পাততে হবে না।

কিন্তু বড়দি, আমি নিত্য আপনার কাছ থেকে ধান-চাল নিলে আপনাদের কী করে চলবে?

সেকথা তোকে ভাবতে হবে না। আমার দু'চারটে দেওর-ননদ বা ছেলেমেয়ে থাকলে কী তাদের না খাইয়ে রাখতাম?

ক্যাতায়নী দেবী প্রায় না থেমেই জিজ্ঞেস করেন, হ্যারে সরলা, বলাইয়ের জন্ম-তারিখ-সময় তোর মনে আছে?

হ্যাঁ, খুব মনে আছে। গত সাতই অঘ্রাণ ও পনেরো পূর্ণ করে ষোলোয় পা দিয়েছে।

ও তো খুব ভোরবেলায় হয়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ, বড়দি, সূর্য ওঠার ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই ও হয়েছিল।

ঠিক তো?

হ্যাঁ, বড়দি, ঠিকই বলেছি।

সেইদিনই ক্যাতায়নী দেবী ওর ঠিকুজি-কোষ্ঠী তৈরি করে দিন দশেক ধরে বার বার সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে নিজেই চমকে উঠলেন। তারপর বলাইকে ডেকে পাঠালেন।

জ্যেঠিমা, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ, বাবা, তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরী আর গোপন কথা আছে।

বলাই অবাক হয়ে বলে, কী কথা আছে জ্যেঠিমা?

এখানে না, ঘরের মধ্যে চল।

বলাইকে নিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ক্যাতায়নী দেবী ওকে পাশে বসিয়ে বললেন, আমার বাবা খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। আমি তার কাছে জ্যোতিষ বিদ্যা শিখেছি। আমার মনে হয়, তিনি আমাকে ভুল শিক্ষা দেননি। বাবার নির্দেশে বিশেষ কারণ ছাড়া আমি কখনই জ্যোতিষ চর্চা করি না। কিন্তু তোর ঠিকুজি-কোষ্ঠী তৈরি করে বিচার না করে পারলাম না।

ষোলো বছরের বলাই চুপ করে ওর কথা শোনে।

দ্যাখ বলাই, আজ তোকে এমন কিছু কথা বলব যা হয়তো তোর বিশ্বাসই হবে না কিন্তু . . . .

জ্যেঠিমা, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব না, তাই কখনও হয়!

কিন্তু যা বলব, তা বিশ্বাস না করার মতই কথা।

ক্যাতায়নী দেবী ওর ঠিকুজি-কোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে বলে যান, দ্যাখ বাবা, তোর আর লেখাপড়া হবে না কিন্তু ব্যবসা করে তুই এত টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি করবি যা তোর কল্পনার বাইরে।

জ্যেঠিমা, আমি কী করে ব্যবসা করব? আমাদের তো টাকাকড়ি নেই।

তোদের কী আছে আর নেই, তা কী আমি জানি না?

উনি একটু থেমে বলাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, দ্যাখ বাবা, তোকে কী করতে হবে বা না হবে, সব বলে দেব কিন্তু তুই কী একটু কষ্ট করতে পারবি?

হ্যাঁ, জ্যেঠিমা, তা পারব।

তাহলে শোন বাবা, তোর ঠিকুজি-কোষ্ঠী অনেকবার অনেকরকমভাবে বিচার করে দেখেছি, তুই লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করে দশ হাতে টাকা রোজগার করবি।

ক্যাতায়নী দেবী প্রায় না থেমেই বলে যান, তবে তোকে স্থানত্যাগ করতে হবে। . . . .

স্থানত্যাগ মানে?

স্থানত্যাগ মানে তোকে এই কাটোয়া ছাড়তে হবে।

কাটোয়া ছেড়ে কোথায় যাব? বর্দ্ধমানে?

আমার মনে হয় কলকাতায় গেলেই তোর ভাল হবে।

কলকাতায়?

হ্যাঁ, বাবা, কলকাতায়। জন্মস্থানেব দক্ষিণেই তোর পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

কিন্তু জ্যেঠিমা, আমি তো কোনদিন কলকাতায় যাইনি।

বলাই মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তাছাড়া অতবড় শহরে গিয়ে কী আমি কোনো পাত্তা পাব?

দ্যাখ বলাই, যখন ভগবান কারুর দিকে মুখ তুলে তাকান, তখন কোথা থেকে কীভাবে যে তিনি সাহায্য করবেন, তা আমরা ভাবতেও পারি না। . . . .

এইটুকু বলেই মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মোটকথা, তোর ঠাকুমার কথামত উনি কলকাতায় গিয়ে প্রথমে একটা লোহালক্কড়ের দোকানে সামান্য চাকরি করার পর ব্যবসা-বাণিজ্য করে পাঁচ বছরের মধ্যেই রীতিমতো বড়লোক

হয়ে যান। তারপর যতদিন গেছে উনি তত বেশি উন্নতি করেছেন।

আমি বলি, বলাই জ্যেঠু ওই অবস্থা থেকে এত বড়লোক হয়েছেন তা ভাবাই যায় না।

তোর জ্যেঠু যে তোর ঠাকুমাকে কি শ্রদ্ধা করতেন, তা তুই ভাবতে পারবি না। আর সেইজন্য উনি তোর বাবাকেও প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন।

আমি একটু হেসে বলি, তবে বাবাও তো বলাই জ্যেঠুকে দারুণ শ্রদ্ধা করেন।

হ্যাঁ, তা তো করেনই।

মা একটু থেমে বলেন, এইসব কারণেই তো তোর বলাই জ্যেঠু তোর ছোট জ্যেঠুর কাছ থেকে এক পয়সাও ভাড়া নেন না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

এইসব অনেক দিন আগেকার কথা হলেও আজ হঠাৎ সবকিছু মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, বাবা আর ছোটজ্যেঠুর নিত্যকার সান্ধ্য বৈঠকের কথা, মা আর ছোটমা'র দৈনন্দিন আড্ডা ও রান্নাবান্না লেনদেনের কথা। মনে পড়ছে রাধার কথাও।

রাধা আমার চাইতে বোধহয় চার-পাঁচ বছরের ছোট হবে। ছোটবেলায় ও আর অমি একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া খেলাধূলা গল্পগুজব করতাম। কখনও কখনও আমরা দু'জনে ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারিও করেছি।

তবে একটু বড় হবার পরই বুঝলাম, রাধা বড্ড আদুরে। সে অন্যায় করলেও ছোটজ্যেঠু বা ছোটমা কখনই তাকে কিছু বলেন না। নিজের কোনো ভাইবোন নেই বলে রাধাকে নিজের ছোট বোন মনে করে ওর অনেক অন্যায় বা খামখেয়ালিপনাকেও হাসি মুখে মেনে নিতাম। কদাচিৎ কখনও যদি আমি ওকে একটু-আধটু বকুনি দিয়েছি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মা ছুটে এসে বলতেন, আঃ, মানিক! ওকে বকছিস কেন?

আমি কিছু বলতে গেলেই মা বলতেন, তোর বন্ধু-বান্ধবরা তো তিন-চারটে ভাইবোনকে নিয়ে কি সুন্দর হেসে-খেলে থাকে আর তুই রাধার সঙ্গে একটু মিলেমিশে থাকতে পারিস না?

ব্যস! রাধাকে আর কে পায়! আমার পড়াশুনা মাথায় উঠল। আমি ওকে গল্প শোনাতে বসি।

একথা আজ নিঃসন্দেহে স্বীকার করবো, রাধা আমাকে সত্যি ভালবাসতো।

ও আমাকে কাছে পেলে খাওয়া-দাওয়া বা ঘুম পর্যন্ত ভুলে যেত। আমিও রাধাকে যথেষ্ট ভালবাসতাম, স্নেহ করতাম। স্কুল থেকে ফিরে এসেই ওকে দেখতে না পেলে আমারও ভাল লাগতো না।

এইভাবেই বছরের পর বছর কেটে গেল। আমার দেহে ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হল; চতুর্দশী-পঞ্চদশী রাধার দেহেও লাবণ্যের বন্যা এলো।

রাধা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, জানো মানিকদা, তোমার মুখে একটু-আধটু দাঁড়ি-গোফ বেরিয়েছে বলে দারুণ দেখতে লাগে।

আমিও হাসতে হাসতে বলি, তাই নাকি?

হ্যাঁ, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

তোকে আর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে না।

আমি একটু থেমে বলি, এই বয়সে সব ছেলেমেয়েকেই দেখতে ভাল লাগে। তুইও তো দিন দিন সুন্দর হচ্ছিস।

রাধা আমার তক্তাপোষের উপর বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে, তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না।

থাক; তোকে আর আমার রূপচর্চা করতে হবে না।

একটু শাসন করার জন্য বলি, আলতু-ফালতু বকবক না করে পড়তে যা। কালকে তো তোর ক্লাস টেস্ট।

রাধা আমার কথার জবাব না দিয়ে এক দৌড়ে ওদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে একটা খাতা আমার হাতে দিয়ে বলে, আজই ক্লাস টেস্ট ছিল। দেখ, কত পেয়েছি।

পঁচিশের মধ্যে বাইশ পেয়েছে দেখে এক গাল খুশির হাসি হেসে আমি ওর গাল টিপে আদর করে বলি, এইজন্যই তো তোর সব বাঁদরামি সহ্য করি।

রাধাও সঙ্গে সঙ্গে আমার গাল টিপে আদর করে বলে, তোমার সঙ্গে বাঁদরামি করতে আমার দারুণ ভাল লাগে।

ব্যস! এই কথা বলেই ও প্রায় দৌড়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি চিৎকার করে বলি, এবার তুই আমার ঘরে ঢুকলেই মার খাবি।

রাধা বোধহয় মা'র ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই আরো জোরে চিৎকার করে বলে, মানিকদা, কাল থেকে শুধু তোমার ঘরেই ঢুকব; বড়মা'র ঘরে ঢুকব না। দেখি, তুমি কি করো!

হ্যাঁ, রাধা এইরকমই ছিল। একদিকে অসম্ভব বুদ্ধিমতী ও মেধাবী, অন্যদিকে একটু বেশি বেপরোয়া আর খামখেয়ালী। কখন যে ও কি করবে, তার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না।

তখন শীতের শুরুতেই যুবক সমিতির মাঠে নট্ট কোম্পানী বা ঐ ধরনের কোনো নামকরা দলের যাত্রা হতো পর পর তিন রাত্তির। বাবা আর ছোটজ্যেঠু না গেলেও মা, ছোটমা, আমি, রাধা, নিবারণকাকা প্রত্যেকবার ঐ যাত্রা দেখতে যেতাম। তবে মা, ছোটমা আর নিবারণকাকা এক রাত্তির গেলেও আমি তিন রাত্তিরই যেতাম। আগে রাধাও আমার সঙ্গে যেতো কিন্তু ও একটু বড় হবার পর আমি ওকে নিয়ে যেতে চাইতাম না।

না, না, রাধা, তুই আমার সঙ্গে যাবি না।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমার কি অসুবিধে?

আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে বসব ; তুই সেখানে থাকলে আমাদের অনেক অসুবিধে।

আমি তোমার একদিকে বসব, অন্যদিকে তোমার বন্ধুরা বসবে। তাহলে তো কোনো অসুবিধে হবে না?

হ্যাঁ, হবে।

না, হবে না।

তুই কী করে জানলি আমাদের অসুবিধে হবে না?

আমি জানি।

ঘোড়ার ডিম জানিস।

আমার বদলে যদি অন্য কেউ তোমার পাশে থাকে, তাহলে কী করবে?

তোর মত বুড়ো ধাড়ি ন্যাকা মেয়েকে বসতেই দেব না।

ন্যাকার বদলে যদি কোনো বোকা বা বুদ্ধিমতী মেয়ে পাশে বসে, তাহলে বুঝি আপত্তি নেই?

না, নেই।

আমি জানতাম, ওর মাথায় যখন একবার ভূত চেপেছে, তখন হাজার বার বারণ করেও ওর যাওয়া বন্ধ করতে পারব না। তাছাড়া ছোটজ্যেঠু বা ছোটমা-ও ওকে নিরস্ত করবেন না। তাই শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলাম, ঠিক আছে চল, কিন্তু পর পর তিন রাত্তির জেগে যাত্রা দেখে অসুখ করলে আমাকে কিছু বলতে পারবি না।

আমার অসুখও করবে না, তোমাকেও কিছু বলব না।

আজ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, শীতের রাত্রে শাল-কম্বলে রাধাকে জড়িয়ে যাত্রা দেখতে গিয়েই চমকে উঠেছিলাম ওর হাব-ভাব দেখে। পরের দিনই ওকে আমি বলেছিলাম, দ্যাখ রাধা, আমার নিজের তো কোনো ভাইবোনই নেই; তোকেই আমি ঠিক ছোট বোনের মত ভালবাসি। তুই আর এখন ছোট্ট বাচ্চা

না ; তোর সতেরো বছর বয়স হল আর আমিও যথেষ্ট বড় হয়েছি। এখন আমাদের দু'জনেরই একটু বুঝে-সুঝে মেলামেশা করা উচিত।

বুঝে-সুঝে মানে?

রাধা মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে, তুমি কী চাও, আমি তোমার কাছে আসব না?

একশ' বার আসবি।

তবে?

আমি ওর চোখের' পর চোখ রেখে বলি, কাল-পরশু দু'রাত্তির তুই যেভাবে আমাকে জড়াজড়ি করে যাত্রা দেখেছিস, তা ঠিক হয়নি।

রাধা একটু হেসে বলল, ঐভাবে জড়াজড়ি করে না বসে সারা রাত জাগা যায়?

হ্যাঁ, যায়।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তুই আর আমাকে জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরবি না।

ঠিক আছে ; জানা থাকল।

রাধা গম্ভীর হয়ে কথাটা বলেই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যস! পরের দিন থেকেই রাধা আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করলেও আমার ঘরে ঢুকতো না বা আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও বলতো না। পাঁচ-সাতদিন পর মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, রাধার সঙ্গে তোর কি ঝগড়া হয়েছে?

আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করবো কেন? আমি কী কচি বাচ্চা?

ঝগড়া হয়নি তো তোরা কথাবার্তা বলিস না কেন?

এত আদুরে ন্যাকা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না।

না, মা আর আমাকে কোনো প্রশ্ন করেননি ; তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, কোনো বিশেষ কারণ না থাকলে আমি কখনই রাধার সম্পর্কে ঐ ধরনের কথা বলতাম না।

মাস খানেক ঘুরতে-না-ঘুরতেই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে রাধার নানা খবর আমার কানে এলো। সবাইকেই বললাম, তোরা তো জানিস, রাধা আমার নিজের বোন না হলেও ওকে চিরকালই আমি নিজের ছোট বোনের মত ভালবেসেছি, স্নেহ করেছি, কিন্তু ইদানীং কালে ওর হাবভাব, চালচলন, যখন তখন গায়ে ঢলে পড়া ভাল লাগেনি বলেই ওকে বেশ বকুনি দিয়েছি।

একটু থেমে বলি, তারপর থেকেই রাধা আমার ঘরে আসা বা আমার সঙ্গে

কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে।

সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে, তুই একটু বকুনি দিয়েছিস বলে ও আসা-যাওয়া কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছে?

হ্যাঁ।

রাধা কী জানে না, তোরা সবাই ওকে বা ওর বাবা-মা'কে কি চোখে দেখিস?

সবই জানে।

তবে?

আসল কথা হচ্ছে, ছোটজ্যেঠু আর ছোটমা ওকে আদর দিয়ে দিয়ে এমন মাথায় চড়িয়েছেন যে ও নিজের খেয়াল-খুশিমত যা ইচ্ছে তা করতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সুকুমার দত্ত বা ঐ হতচ্ছাড়া উমাশঙ্করের মত দুটো অসভ্য বাঁদর ছেলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করার ফল যে বিশেষ ভাল হবে না . . . . তা জানিস?

জানব না কেন? সবই জানি, সবই বুঝি।

না, না, মান-অভিমান ভুলে তুই কিছু কর। তা না হলে রাধার কখন যে কি হবে, তা কেউ বলতে পারে না।

কয়েক দিন ভাবনা-চিন্তা করার পর অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে একদিন রাধাকেই বললাম, কীরে, রাগ কমেছে?

রাধা গম্ভীর হয়ে বলল, আমি তো রাগ করিনি।

আমি একটু হেসে বলি, রাগ করিসনি তো আমার ঘরে আসিস না কেন? আমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন?

তুমি ভাল ছেলে ; যদি আমার সঙ্গে মেলামেশা করলে খারাপ হয়ে যাও, তাই আসি না, কথাও বলি না।

তুইও তো ভাল মেয়ে।

রাধা তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে বলল, কী বললে মানিকদা, আমি ভাল মেয়ে?

একশ' বার তুই ভাল মেয়ে।

আমি একটু থেমে বলি, তোর মত হাসি-খুশি পড়াশুনায় ভাল মেয়ে ক'টা পাওয়া যায়?

সত্যি নাকি?

সত্যিই তো। আমি কী মিথ্যে বলেছি?

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, তুই পড়াশুনায় ভাল বলে আমার কত গর্ব

হয়, তা জানিস? জানিস, তোকে আমি কত ভালবাসি, স্নেহ করি?

তুমি আমাকে ভালবাসো আর আমি বুঝি তোমাকে ভালবাসি না?

শুধু আমি কেন, সারা দুনিয়ার লোক জানে, তুই আমাকে ভালবাসিস।

তাহলে? তাহলে সেদিন তুমি আমাকে ঐভাবে যা-তা বললে কেন?

আমি দু' পা এগিয়ে একটু হেসে দু' হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বললাম, ওরে পাগলী, আমি কী তোকে যা-তা বলতে পারি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যা তা বলেছ।

আমি মাথা নেড়ে বলি, সত্যি আমি যা-তা বলিনি। শুধু বলেছি, আমরা এমনভাবে মেলামেশা করবো যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে।

ঐ শীতের মধ্যে তোমাকে একটু জড়িয়ে বসে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে যে লোকে যা-তা বলবে?

আমি একটু চাপা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করি, তুই বড় হচ্ছিস না?

হ্যাঁ, হচ্ছি তো।

আমিও কী কচি বাচ্চা আছি?

আমি কী বলেছি, তুমি কচি বাচ্চা আছো?

এই বয়সে কী ঠিক আগের মত মেলামেশা করা উচিত?

আমি কী এমন বুড়ো ধাড়ি হয়েছি যে তোমার সঙ্গেও আগের মত মেলামেশা করতে পারবো না?

রাধা এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, আমি কী রাস্তার কোনো আজেবাজে ছেলেকে জড়িয়ে বসে যাত্রা দেখছিলাম যে তুমি আমাকে অত লেকচার দিলে?

আমি ওর দুটো হাত ধরে বলি, আমি কী বলেছি, তুই বুড়ো ধাড়ি হয়েছিস বা কোনো আজেবাজে ছেলেকে জড়িয়ে সারা রাত যাত্রা দেখেছিস?

আমি একটু থেমে বলি, শোন রাধা, এই বয়সে আমারও যেমন যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করা অন্যায়, তোরও তেমনি ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে একটু সাবধান হওয়া দরকার।

রাধাকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করি, কীরে. আমি ঠিক বলেছি?

এবার রাধা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলে বলে কী আমি সারাদিন বাড়ির মধ্যে বন্দী থাকবো? নাকি সারাদিন বোবা হয়ে বসে থাকব?

ও একটু থেমে বলে, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছিলে না বলেই তো আমাকে এর-ওর সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে হয়েছে।

আমি একটু হেসে বলি. ঠিক আছে, এবার থেকে তুই যখন তখন আমার সঙ্গে গল্পগুজব করিস ; আমি কিছু বলব না কিন্তু তুইও আর আলতু-ফালতু কারুর সঙ্গে ঘুরে-ফিরে বেড়াবি না।

ঠিক আছে, আমি তোমার কথা রাখব কিন্তু তুমি বকবে না তো?

না, না, আমি তোকে বকব না।

রাধা প্রায় দৌড়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়েই চিৎকার করে উঠল, বড়মা, আমার আর মানিকদার ভাব হয়ে গেছে।

আমি ঘরে বসেই মা-র গলা শুনি, বাঁচিয়েছিস। তোরা কথাবার্তা বলছিলি না বলে আমারই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

বন্ধুবান্ধবরা সব শোনার পর বলল, ভালই করেছিস। রাধার মত মেয়েকে বেশি কিছু বললেই হিতে বিপরীত হতো।

আজ আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য, রাধা একটু বেশি আদুরে আর খামখেয়ালী থাকলেও ওর অনেক গুণও ছিল। সবচাইতে বড় কথা, ও অসম্ভব মেধাবী ছিল। খুব ভোরবেলায় উঠে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক পড়াশুনা করেই ও অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করে প্রত্যেকবার ক্লাসে উঠতে উঠতে ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পাস করল। সারাদিন স্কুলে কাটিয়ে আর বিকেল-সন্ধেয় খেলাধূলা গল্পগুজব আড্ডায় মেতে থাকার জন্য রাধা বইপত্তর নিয়ে বসতে-না-বসতেই ঘুমে ঢুলে পড়তো। তবে হ্যাঁ, যেদিন মিলন পাঠাগার থেকে নতুন বই আনতো, সেদিনই সে বই শেষ না করে ও কখনই ঘুমুতে পারতো না। এইজন্যই ও মাধ্যমিক পাস করার আগে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর, দুই বিভূতি, বিমল মিত্তির-নারায়ণ গাঙ্গুলী-অচিন্ত্য-প্রেমেন মিত্তিরের অধিকাংশ বইই শেষ করে ফেলে। রাধা যখন ক্লাস সেভেন'এ পড়ে, তখনই আমি ওকে দু'একটা ইংরেজি উপন্যাস পড়াতে শুরু করি। ক' বছরের মধ্যেই দেখলাম, ও অস্কার ওয়াইল্ড, কনন ডয়েল. ডিকেন্স আর গ্রাহাম গ্রীণের ভক্ত হয়ে উঠেছে। এইসব গুণের জন্য আমি ওকে না ভালবেসে পারতাম না।

তবে হ্যাঁ, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা পড়াশুনা করেও সংসারের যে সমস্ত কাজকর্ম করে, সেসব ব্যাপারে রাধার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা ইচ্ছা কোনোদিন দেখিনি। ছোটমা কদাচিৎ কখনও ছোটখাটো কোনো কাজকর্ম করে দেবার জন্য অনুরোধ করলে ও একটু হেসে বলতো, পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে পড়া বন্ধ রেখে আমি তোমাকে তরকারী কেটে দেব? তুমি কী পাগল হয়েছ?

সাংসারিক কাজকর্মের ব্যাপারে চরম অনীহা থাকলেও ঘরদোর গোছানো আর কাপড়-চোপড় পরার ব্যাপারে রাধার রুচির প্রশংসা না করে কেউ থাকতে

পারতো না। মা ওকে প্রায়ই বলতেন, ঈশ্বর তোকে যেমন রূপ দিয়েছেন, তেমনই রুচি দিয়েছেন। তোকে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

রূপ রুচি আর সদ্য বিকশিত যৌবন সম্পর্কে রাধা বড্ড বেশি সচেতন ছিল। তাছাড়া ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তার প্রচেষ্টারও অভাব ছিল না। মাঝে মাঝে ওর সাজ-পোশাক দেখে আমি লজ্জায় দ্বিধায় ওর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারতাম না।

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবার পর অখণ্ড অবসর পেয়েই রাধা সকাল-বিকেল-সন্ধেয় কিছু কিছু বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আড্ডা দিতে মেতে উঠল। এইসব বন্ধুদের দু' চারজন দাদার সঙ্গে রাধার বন্ধুত্ব হতেও দেরি হল না। শুরু হল এইসব ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখা, এখানে-ওখানে বেড়াতে যাওয়া আর পিকনিক।

মেয়ের ব্যাপারে ছোটমা ও ছোটজ্যেঠুর সীমাহীন দুর্বলতা ছিল বলে তাদের কিছু না বলে একদিন মাকে বললাম, মা, তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি, রাধা যে কোনদিন একটা বিচ্ছিরি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়বে।

মা একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, দিন তিনেক আগে নকুলের মা আমাকে ঠিক এই কথাই বলে গেলেন।

নকুলদাদের পাশের বাড়িতেই তো রাধার বেষ্ট ফ্রেণ্ড থাকে। সেখানেই ....

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবিকা। ওকে আমি খুব ভাল করে চিনি।

মা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, রাধার সঙ্গে কতদিন ও আমার এখানে এসেছে কিন্তু মেয়েটার হাব-ভাব চাল-চলন কথাবার্তা কিছুই আমার ভাল লাগেনি।

নকুলদার মা ঐ দেবিকার দাদার বিষয়ে কিছু বলেননি?

হ্যাঁ, বললেন, ছেলেটা বুঝি বিশেষ ভাল না।

বিশেষ ভাল না মানে? অত্যন্ত বদ।

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, নেহাত ভাল ফুটবল খেলে বলে পার পেয়ে যাচ্ছে।

দু' এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বলি, শুধু দেবিকার দাদা না, ঐ ধরনের আরো দু' চারটে বাঁদর ছেলের সঙ্গেই রাধা রোজ আড্ডা দেয় আর ঘুরে-ফিরে বেড়ায়।

ছোটজ্যেঠু ঠিক এই সময়ই স্কুল থেকে রিটায়ার করলেন কিন্তু কাটোয়া ছেড়ে চলে যাবার কোন পরিকল্পনা ওঁর ছিল না। উনি বরাবরই বলতেন, মেয়েটা গ্রাজুয়েট হবার পর ওর বিয়ে দিয়েই রাণাঘাটে ফিরে যাবো, কিন্তু না,

শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি। রাধাকে বিয়ে করবে বলে দু' তিনটি ছেলে এমন কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি-মারামারি শুরু করল যে ওঁরা মেয়েকে নিয়ে প্রায় পালিয়ে গেলেন বলা যায়।

রাধা রাণাঘাটে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়। অনার্স নিয়েই বি. এ. পাস করে। তারপর নিজের পছন্দমত একটি ছেলেকে বিয়ে করে।

সদ্য প্যারা-টাইফায়েড থেকে উঠেছি বলে রাধার বিয়েতে আমি যেতে পারিনি। তাছাড়া বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না। তবে নিবারণকাকাকে সঙ্গে নিয়ে মা গিয়েছিলেন।

মা রাণাঘাট থেকে ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, ছোটজ্যেঠু-ছোটমা জামাই পেয়ে খুশি?

তা জানি না; তবে ছেলেটিকে দেখেশুনে আমার বিশেষ ভাল লাগেনি।

কেন?

প্রথম কথা ছেলেটা তেমন শিক্ষিত না; নেহাতই ডিপ্লোমা পাস।

মা একটু থেমে বলেন, রাধা যে কেন একজন ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার বা প্রফেসারকে পছন্দ না করে এইরকম একটা অতি সাধারণ ছেলেকে পছন্দ করল, তা জানি না।

নিবারণকাকা পাশেই বসেছিলেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, যে সব বন্ধু বরযাত্রী এসেছিল, তাদের দেখেই বুঝেছি, জামাইটিও বিশেষ সুবিধের হবে না।

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবার পর রাধা যখন ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল, তখন নানাজনের কাছে ওর নিন্দা শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত রাধাকে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, শোন, তোকে একটা সোজা কথা বলে দিচ্ছি, যখন ভদ্র-সভ্যভাবে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে শিখবি, তখন আমার সঙ্গে কথা বলিস! তার আগে তুই আমার সঙ্গে কোন কথা বলবি না।

মুহূর্তের জন্য থেমে বলেছিলাম, সারা দুনিয়ার লোকের কাছে তোর কীর্তি-কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

বোধহয় এই কারণেই রাধা আমাকে কোন চিঠিপত্র লেখে না; আমিও ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখি না।

তাইতো চাঁপা রাধাদের ওখানে চলে যাওয়ায় আমি যেমনই চিন্তিত, তেমনই সমস্যায় পড়েছি। রাধাদের ঠিকানা তো দূরের কথা, ওর শ্বশুরবাড়ির কোন খোঁজ-খবরও আমি জানি না। আমি চুপ করে থাকতেও পারছি না; আবার যোগাযোগ করার কোন উপায়ও জানা নেই। কি অস্বস্তিতে যে দিন কাটাচ্ছি, তা ভগবানই জানেন।

আট

রোগ-শোক জরা-দারিদ্র বিচ্ছেদ-বেদনা সত্ত্বেও সময় তার আপন গতিতে এগিয়ে চলে। ভাদ্দরের মেঘ সূর্যকে লুকিয়ে রাখলেও পৃথিবীর চলা থেমে যায় না। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতই সংসারের সুখ-দুঃখে উতলা হয়ে সময় থমকে দাঁড়ায় না। সময় বড় নির্মম, বড় উদাসীন।

ঠিক আড়াই বছর হল চাঁপা চলে গেছে। তবু আমার দিন ঠিকই কেটে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রী পড়াচ্ছি, খাওয়া-দাওয়া করছি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি কিন্তু তবুও প্রতি মুহূর্তে চাঁপার অনুপস্থিতি অনুভব না করে পারি না।

আয়েষা চাঁপাকে দেখেনি। তাই ও বিশেষ কিছু না বললেও বন্ধু-বান্ধব আর শ্রীপর্ণা প্রায়ই চাঁপার কথা বলে। বছর দুয়েক ওর কোন খোঁজ-খবর নেই বলে উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করে কিন্তু আমি বিশেষ কিছু বলি না।

কী বলব?

আমি কী করে বলব, চাঁপার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত? ওর জন্য যে প্রতি মুহূর্তে একটা বিচিত্র শূন্যতা অনুভব করি, তাও প্রকাশ করতে পারি না।

ইদানীং চাঁপার জন্য সত্যি আমি চিন্তিত। মাঝে মাঝেই মনে হয়, ও বোধহয় ভাল নেই। হয়তো কোন বিপদে পড়েছে বলেই আমাকে চিঠিপত্র লিখতে পারছে না।

রাণাঘাট থেকে জামসেদপুর যাবার পর চাঁপার একটা মাত্র পোস্টকার্ড এসেছিল কিন্তু তাতে কোন ঠিকানা ছিল না। লিখেছিল, নতুন বাড়িতে গিয়ে ঠিকানা জানাবে কিন্তু আজ পর্যন্ত ঠিকানা জানিয়ে ওর কোন চিঠি এলো না।

সারাদিন কাজকর্ম দায়-দায়িত্বের জন্য অন্য চিন্তা-ভাবনা করার বিশেষ অবকাশ না পেলেও রাত্রে শোবার পর প্রায় রোজই চাঁপার কথা মনে হয়। মনে হয়, হঠাৎ চাঁপার বিয়ে হয়ে যায়নি তো? ওর স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের জন্যই কী চিঠি লিখতে পারছে না? আরো কত কি আবোল-তাবোল চিন্তা করি।

এসব প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাই না। তবে এইটুকু বুঝতে পারি, চাঁপা সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে নিশ্চয়ই আমাকে চিঠি লিখতো। আমাকে চিঠি না লিখে ও এতকাল চুপ করে থাকতে পারতো না।

আবার কখনো কখনো মনে হয়, যে কোন কারণেই হোক, চাঁপা যখন আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখছে না, তখন আমিই বা ওর কথা এত চিন্তা করছি কেন? ও যদি আমাকে ভুলতে পারে, তাহলে আমিই বা ওকে ভুলে যাব না কেন?

তাছাড়া চাঁপা আমার কে? নেহাত নিবারণকাকার মেয়ে বলে ওকে আমরা

ভালবেসেছি, স্নেহ করেছি। সেও আমাদের আপনজন মনে করে আমাদেরই একজন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই বন্ধন, এই প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক যে চিরদিন টিকে থাকবে, তার তো কোন মানে নেই। যে যুগে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না, সন্তান বাবা-মা'কে সংসার থেকে বিদায় করে দিচ্ছে, ভাইবোনের মধুর সম্পর্ক চরম তিক্ততায় পরিণত হচ্ছে, সে যুগে চাঁপা আমার সঙ্গে সম্পর্ক বা যোগাযোগ না রাখলে আশ্চর্য হবার কী আছে?

কিন্তু চাঁপাকে মন থেকে নির্বাসিতা করতে গিয়েও পদে পদে হোঁচট খাই। বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল ঢালার পর সাবান মাখতে গিয়ে দেখি সাবান শেষ; জামাকাপড় পরতে গিয়ে দেখি সব পায়জামাই ময়লা হয়ে নীচে পড়ে আছে। এই আড়াই বছরে অন্তত দশ-বারোবার আমার চেক বই হারিয়েছে। তারপর কখনো পেয়েছি বইপত্তরের মধ্যে, কখনো পেয়েছি তোষকের নীচে বা ছেড়ে ফেলা জামার পকেটে। মাসে অন্তত দু'একদিন বাবা-মা'র ছবির সামনে ধূপকাঠি জ্বালাতে গিয়ে আবিষ্কার করি, একটাও ধূপকাঠি নেই! এই ধরনের ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটে। ঘটবেই। তখনই মনে হয়, চাঁপা থাকলে কখনই এইসব সমস্যা দেখা দিত না।

সিগারেট খেতে খেতে যদি ঘুমিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আজকাল আর শুয়ে আরাম করে সিগারেট খেতে পারি না। চাঁপা চলে যাবার পর দু'তিনদিন বিছানার চাদর আর তোষক বেশ খানিকটা পোড়াবার পরই শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। আজকাল বারান্দায় বসে সিগারেট খাবার পরই শুতে যাই।

রাত্রে শোবার পর কখনও কখনও জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখি। আচ্ছা, কাল সকালেই যদি চাঁপা এসে হাজির হয়? যদি ওর ডাকাডাকিতেই আমার ঘুম ভাঙে? যদি . . . .

এইসব আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ি।

চাঁপা চলে যাবার পর আমার একটা বদ অভ্যাস হয়েছে। আগে দিনে ঘুমুতে আমার ভাল লাগতো না, পছন্দও করতাম না। এমনকি বন্ধুবান্ধবদের বলতাম, শুধু বাঙালি আর স্প্যানিশরা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জাতির মানুষ দিনের বেলায় ঘুমোয় না। বহু বাঙালি ব্যবসাদার নিছক দিবানিদ্রার লোভে দুপুরবেলায় দু'চার ঘণ্টা দোকান বন্ধ রাখেন। আগে আমি দুপুরবেলা মা'র সঙ্গে গল্পগুজব করে আর বইপত্তর পড়েই কাটিয়ে দিতাম। মা মারা যাবার পর চাঁপার সঙ্গে এক-আধ ঘণ্টা কথাবার্তা বলার পর বইপত্তর পড়তে পড়তেই বিকেলবেলার চা খাবার সময় হয়ে যেত কিন্তু এখন বইপত্তর পড়তে পড়তে রোজ ঘুমিয়ে পড়ি। আজও ঘুমিয়েছিলাম। অঘোরে ঘুমুচ্ছিলাম।

হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধরে চিৎকার করতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই সুধীর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আমার ঘরে ঢুকেই বলল, দ্যাখ, দ্যাখ, কে এসেছে।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই শ্রীপর্ণা চাঁপাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

আমি কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ওর দিতে তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ? কোথা থেকে এলি?

চাঁপা মুখ নীচু করে বলল, রাঁচী থেকে।

রাঁচী থেকে?

সুধীর আগের মতই উত্তেজিত হয়ে বলে, আমার দোকানের কেষ্ট ঘাটশিলায় ওর দিদি-জামাইবাবুর কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার সময় হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাটতে গিয়ে হঠাৎ ওকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে দেখে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপর্ণাও বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, দাদা, চাঁপা যে কি সর্বনাশের হাত থেকে বেঁচে গেছে, তা আপনি ভাবতে পারবেন না।

এবার আমি চাঁপাকে জিজ্ঞেস করি, তুই জামসেদপুর থেকে রাঁচী গিয়েছিলি কেন?

ও মুখ নীচু করেই বলে, সে অনেক কথা।

তা হঠাৎ এভাবে খবর-টবর না দিয়ে . . . .

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চাঁপা এক পলকের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি জামাইবাবুকে ছুরি মেরে পালিয়ে এসেছি।

আমি অবাক হয়ে বলি, তুই ছুরি মেরেছিস?

চাঁপা জবাব দেবার আগেই শ্রীপর্ণা আগের মতই উত্তেজিত হয়ে বলল, ও ঠিক করেছে। আমি হলে তো ঐ হতচ্ছাড়াটাকে একেবারে শেষ করে দিতাম।

অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে আমি বললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার।

শ্রীপর্ণা চাঁপার একটা হাত ধরে বলল, হ্যাঁরে, আমাকে যা যা বলেছিস, সব দাদাকে বল।

চাঁপা শ্রীপর্ণার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, সব বলব?

হ্যাঁ, মোটামুটি সবই বলবি।

জামসেদপুরের বাড়িতে পৌঁছেই চাঁপা অবাক হয়ে যায়। একটু চাপা হাসি হেসে বলে, রাধাদি, তোমাদের বাড়িটা কি বিরাট আর সুন্দর!

রাধা একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, হ্যাঁ, বাড়িটা বেশ বড়।

শুধু বড় বলছো কেন? এত সুন্দর বাড়ি কী কাটোয়ায় আছে?

চাঁপা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, প্রত্যেকটা ঘরদোর বারান্দা যেমন বড়, তেমনই সুন্দর। রান্নাঘরটা তো মানিকদার শোবার ঘরের চাইতেও বড়।

রাধা একটু বিরক্ত হয়েই বলে, তোর মানিকদার মত তো আমরা সেকেলেও না, আধা বেকারও না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তোর মানিকদা ভাঙাচোরা পুরনো বাড়িতে থাকে বলে কি আমাদেরও ঐরকম বাড়িতে থাকতে হবে?

রাধার কথা শুনে চাঁপা চমকে ওঠে। বিরক্তও হয় মনে মনে। কিন্তু মনের ভাব মনের মধ্যে চেপে রেখে ও বলে, আমি তো নিজেই বললাম, তোমাদের বাড়িটা খুব ভাল। তুমি শুধু শুধু রাগ করলে।

রাধা কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে।

চাঁপাই আবার কথা বলে, রাধাদি, ছোটমা তো সকাল থেকে নীচের ঘরেই আছেন। উনি কি ঐ ঘরেই থাকবেন, নাকি দোতলায় . . . .

না, না, দোতলায় না; একতলাতেই থাকবেন।

ছোটমা তো বাতের রুগী। একতলায় তো ঠাণ্ডা হবে; দোতলায় থাকলে বোধহয় . . .

চাঁপাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রাধা বলে, না, না, মা দোতলায় থাকবেন না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, রাণাঘাটের বাড়ির তুলনায় এ বাড়ির একতলা তো স্বর্গ।

সে তো একশ' বার।

চাঁপা একটু থেমে বলে, তবে দোতলার ঘরগুলোতে অনেক বেশি রোদ্দুর আসে বলে . . . .

দোতলায় তোর জামাইবাবু থাকেন।

চাঁপা একটু হেসে বলে, জামাইবাবুর ঘর ছাড়াও তো আরো দুটো ঘর আছে।

রাধা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ! চাঁপা! তুই বড্ড বেশি কথা বলিস। আমার সঙ্গে অযথা বেশি কথা বলবি না।

সেই শুরু। জামসেদপুরের বাড়িতে পা দেবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চাঁপা বুঝতে পারে, এখানে সে কখনই সুখে থাকতে পারবে না।

দু' চার দিনের মধ্যেই চাঁপা আরো অনেক কিছু বুঝতে পারল, জানতে পারল।

ভোর ছ'টা নাগাদ সরস্বতীর মা একেবারে গোয়ালার বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে

এ বাড়িতে কাজে চলে আসে। ও বাসনকোসন মাজতে শুরু করলেই চাঁপা বাথরুমে চলে যায়। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়েই ছোটমা'কে নিয়ে আবার বাথরুমে ঢুকলেই সরস্বতীর মা ওদের ঘরখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়।

চাঁপা ছোটমা'কে পিছন দিকের বারান্দায় রোদ্দুরের মধ্যে ইজিচেয়ারে বসিয়ে দুটো পা মোড়ার উপর রেখেই দু' কাপ চা তৈরি করে এনে দু'জনে মিলে খায়।

ঐ চা খেতে খেতেই ছোটমা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিস ফিস করে বলেন, জন্ম জন্ম পাপ করেছিলাম বলেই এই নরকে আমায় থাকতে হচ্ছে আর তোকেও কষ্ট দিচ্ছি।

চাঁপা সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা'র একটা হাত চেপে ধরে খুবই আস্তে আস্তে বলে, আঃ! ছোটমা! রাধাদি শুনলে এখুনি তোমাকে আর আমাকে রাস্তায় বের করে দেবে।

দেয় দেবে; সেখানে অন্তত এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না।

ছোট্ট ফ্লাস্কে দু' কাপ চা ভরে কাপ-প্লেট নিয়ে চাঁপাকে ঠিক আটটার সময় রাধাকে ডাকতে হয়।

রাধাদি!

না, রাধা কোন সাড়া দেয় না।

চাঁপা আবার ডাকে, রাধাদি! রাধাদি! উঠে পড়ো। আটটা বেজে গেছে।

রাধা কোনমতে চোখ মেলে জিজ্ঞেস করে, কীরে, কটা বাজে?

আটটা পাঁচ।

চা দে।

চাঁপা ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ চা ঢেলে দেয়।

রাধা চায়ের চাপে এক চুমুক দিয়েই বলে, চটপট বাথরুমে গরম জল দিয়ে দে।

জল বোধহয় এতক্ষণে ফুটে গেল। এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।

মোটামুটি আধ ঘন্টা বাথরুমে কাটিয়ে রাধা বেরুতে-না-বেরুতেই চাঁপা ওর ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করতে করতেই রাধা জিজ্ঞেস করে, আজকে কী তৈরি করেছিস?

পরোটা আর ডিমের ডালনা।

আচ্ছা যা, কফি নিয়ে আয়।

চাঁপা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই রাধা বলে, তুই চিনি দিবি না। তুই চিনি

দিলেই তো একেবারে সরবত বানিয়ে ফেলিস।

প্রায় বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাবার মত কাপড়-চোপড় পরে রাধা ঠিক সওয়া ন'টায় স্কুলে রওনা হয় ওদেরই গাড়িতে।

রাধা বেরিয়ে যাবার পর পরই চাঁপা এক গেলাস গরম দুধ আর একটা পরোটা সামান্য একটু তরকারি নিয়ে ছোটমা'র পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি বলেন, কীরে, মাহারানী বেরিয়ে গেলেন?

হ্যাঁ।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এই মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য আমরা স্বামী-স্ত্রী কত কষ্ট করেছি। আর সেই মেয়ে সারাদিন আমার সঙ্গে একটা কথা বলে না।

চাঁপা এক টুকরো পরোটা আর তরকারি ওর মুখের সামনে ধরে বলে, ছোটমা, এসব কথা ভেবে লাভ কী? যেভাবে হোক দিন কেটেই যাচ্ছে।

দু' এক টুকরো পরোটা খাবার পর উনি বলেন, দ্যাখ মা, সবাইকেই একদিন বুড়ো-বুড়ী হতে হবে। তোর রাধাদি বোধহয় মনে করে, কোনদিন তার বয়স বাড়বে না। এইভাবেই মেজাজ দেখিয়ে সে জীবন কাটিয়ে দেবে।

উনি একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, তাই কী সম্ভব? সূর্যদেবকেও অস্ত যেতে হয়! আমরা তো সাধারণ মানুষ।

নাও, নাও, ছোটমা, চটপট খেয়ে নাও। জামাইবাবুর ওঠার সময় হয়ে গেল।

দুধের গেলাসে এক চুমুক দিয়েই ছোটমা জিজ্ঞেস করেন, মহাপ্রভু কাল রাত্তিরে কখন ফিরলেন রে?

ঠিক সওয়া একটায়।

এই দুটো বিচিত্র জীবের দাসীবৃত্তি করা তোর কপালে ছিল বলেই বোধহয় কাটোয়া ছেড়ে রাণাঘাটে মরতে এসেছিলি।

চাঁপা একটু হেসে বলে, আমি তোমার জন্যই এসেছিলাম, তোমার জন্যই আছি; কারুর দাসীবৃত্তি করতে আসিনি।

ছোটমা'কে দুধ খাইয়েই চাঁপা দৌড়ে দোতলায় উঠে জামাইবাবুর ঘরে উঁকি দেয়। ওকে একটু নড়া-চড়া করতে দেখলেই চটপট চা তৈরি করে আনে।

জামাইবাবু! জামাইবাবু! চা এনেছি।

দু' চারবার ডাকাডাকির পর উনি চোখ মেলে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, চা এনেছিস?

হ্যাঁ, এই তো চা।

দে।

চাঁপা চায়ের কাপ এগিয়ে দিতেই পুলকবাবু ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, ঘুম ভেঙে তোর সুন্দর মুখখানা দেখলেই মন ভরে যায়।

চাঁপা একটু হেসে বলে, আমার মত সুন্দরী বোধহয় আপনি সারা জীবনেও দেখেননি, তাই না জামাইবাবু?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই চাঁপা বলে, আপনি কাগজ পড়ুন. আমি একটু পরে আবার চা দিয়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁরে, ড্রাইভার ফিরে এসেছে?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।

ওকে বল, গাড়িতে তেল ভরে আনতে। আমি ব্রেকফাস্ট খেয়েই ঘাটশিলা যাবো।

হ্যাঁ, বলছি।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই দু' চারজনকে টেলিফোন করে পুলকবাবু বাথরুমে চলে যান। তারপর সামান্য কিছু খেয়েই উনি সারাদিনের মত তৈরি হয়ে নীচে নামেন।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে উনি মুহূর্তের জন্য শাশুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন?

ঐ একই রকম।

যে ডাক্তারকে দেখাবো, তিনি কয়েক দিনের জন্য পাটনা গিয়েছেন। উনি ফিরে এসেই আপনাকে দেখতে আসবেন।

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

পুলকবাবু আর এক মুহূর্ত দেরি না করে গাড়িতে উঠে চলে যান।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা বলেন, হ্যাঁরে চাঁপা, রাজা-রানী তো বেরিয়ে গেছেন। এবার তোরা দু'জনে একটু কিছু মুখে দে।

হ্যাঁ, ছোটমা, এখুনি খাচ্ছি।

এখানেই বসে খাবি।

রোজই তো তোমার সামনে বসে খাই।

সরস্বতীর মা আর চাঁপা ওর সামনে খেতে বসলেই ছোটমা বলেন, এই বয়সে তো কম সংসার দেখলাম না কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া সংসার বাপের জন্মে দেখিনি।

ওঁর কথা শুনে চাঁপা একটু হাসে।

হাসছিস কী? ঠিকই বলেছি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এখন না হয় মানিক বেশ ভালই আয় করে কিন্তু ওর বাবার আমলে তো ওদের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। তবু ওদের সংসার দেখে বুক জুড়িয়ে যেত।

চাঁপা চুপ করে থাকলেও ছোটমা চুপ করে থাকেন না। একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, মেয়ের বিয়েতে যথাসর্বস্ব খরচ করার পর আমাদের রাণাঘাটের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যেত কিন্তু এই ধরনের লক্ষ্মীছাড়া সৃষ্টিছাড়া জীবন কাটাইনি কোনদিন।

সরস্বতীর মা বলে, বুঝলে, বুড়ীমা, ভাল মাইনে পাই বলে এই বাড়িতে কাজ করি কিন্তু একটুও ভাল লাগে না। এটা হোটেল নাকি স্বামী-স্ত্রীর সংসার, তা ভেবে পাই না।

এইসব গল্পগুজব চলতে চলতেই চাঁপা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ছোটমা, আমি এখুনি উনুনে জল বসিয়ে দিচ্ছি। জল গরম হয়ে গেলেই তোমাকে চান করিয়ে দেব।

ছোটমা'কে চান করিয়ে কাপড়-চোপড় পরিয়ে আবার রোদ্দুরে শুইয়ে-বসিয়ে দেবার পরই রান্নাবান্না করতে চলে যায়। রাধা রবিবার ছাড়া কোনদিনই দুপুরে খায় না কিন্তু পুলকবাবুর জন্য রোজই রান্না করতে হয়। তবে দুপুরের দিকে উনি কদাচিৎ কখনও আসেন। দুপুরে এলেও উনি খেয়েদেয়েই আবার বেরিয়ে যান।

রান্নার পর্ব শেষ করেই চাঁপা ছোটমা'কে খাইয়ে দেয়। তারপর স্নান করে এসে ও নিজেও খেয়ে নেয়।

তারপর ছোটমা'র ঘরে এসে নিজের তক্তাপোষে শুয়েই চাঁপা বলে, ঘুমোচ্ছ নাকি ছোটমা?

না, না, ঘুমোচ্ছি না। দিনরাত্তির শুয়ে-বসে থাকলে কী যখন-তখন ঘুম আসে?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তাছাড়া আকাশ-পাতাল চিন্তা-ভাবনা করি বলে আরো ঘুম আসে না।

কী এত চিন্তা করো?

এখানে আসার পর থেকে শুধু মেয়ে-জামাই'এর কথাই ভাবি।

চাঁপা চুপ করে থাকলেও ছোটমা বলে যান, মেয়েটা লেখাপড়ায় এত ভাল হওয়া সত্ত্বেও কি করে যে পুলকের মত ছেলেকে বিয়ে করল, তা ভেবে পাই না।

একথা বলছো কেন ছোটমা? জামাইবাবু কী ভাল না?

বিয়ের আগে ওর দুর্নাম শুনতে শুনতে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। রাণাঘাটের একটা লোকও পুলককে সহ্য করতে পারতো না।

কেন?

কেন আবার? অসভ্য বাঁদর ছিল বলে।

কিন্তু এখন তো জামাইবাবুকে দেখে বিশেষ খারাপ মনে হয় না। তবে . . .

তবে কী? বল, বল।

রাত্তিরে বোধহয় উনি রোজই নেশা করে ফেরেন।

নেশা কী ও নতুন করছে?

ছোটমা একটু থেমে বলেন, ও বিয়ের আগে থেকেই নেশা করছে।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কি!

তবে যে শুনি, রাধাদি নিজে পছন্দ করে ওঁকে বিয়ে করেছে?

তুই কী ভেবেছিস, আমরা পছন্দ করে এইরকম একটা লোফার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি?

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর চাঁপা বলে, তবে ছোটমা, জামাইবাবু কিন্তু রাধাদির মত মেজাজী না। অন্তত আমার সঙ্গে উনি ভালই ব্যবহার করেন।

তবে যত ভাল ব্যবহারই করুক, তুই একটু সাবধানে থাকিস।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, রাণাঘাটে থাকতে পুলক যে কত মেয়ের সঙ্গে কত কি করেছে, তার তো ঠিকঠিকানা নেই।

ঐ গল্পগুজব করতে করতেই চাঁপা বার বার ঘড়ির দিকে তাকায়। সাড়ে তিনটে বাজলেই বলে, ছোটমা, আমি রাধাদির খাবার-দাবার করতে যাই।

এখন ক'টা বাজে?

সাড়ে তিনটে।

এখনই কেন উঠবি? আরো একটু শুয়ে থাক। রাধা তো কোনদিনই পাঁচটার আগে আসে না।

না, না, অনেকদিন সাড়ে চারটের মধ্যে এসে যায়।

চাঁপা বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে, রাধাদির মেজাজ তো জানো। চা-জলখাবার দিতে এক মিনিট দেরি হলেই . . . .

ওর কথার মাঝখানেই ছোটমা বলেন, জানি, জানি, সবই জানি। তোকে যখন খেতে দিচ্ছে, তখন খাটিয়ে নেবে না কেন?

রাধা বাড়ি ফিরে এসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই জিজ্ঞেস্ করে, হ্যাঁরে চাঁপা, কোন খবর আছে?

না।

তোর জামাইবাবু দুপুরে খেতে এসেছিল?

না।

শোন, রাত্রে আমি খাবো না। বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন আছে। ফিরতেও বোধহয় একটু রাত হবে।

চাঁপা শুধু মাথা নাড়ে। মুখে কিছু বলে না।

রাধা আবার বলে, আমি বা তোর জামাইবাবু ফেরার আগেই যেন তুই ঘুমিয়ে পড়িস না।

তুমি বা জামাইবাবু বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তো আমি ঘুমোই না।

রাধা রোজ না হলেও দু'চারদিন পর পরই সন্ধের দিকে কোন না কোন বন্ধুর বাড়ি যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থাকলে সাড়ে দশটা-এগারটার আগে ফেরে না। তবে অন্যান্য দিন ন'টার মধ্যেই ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ে একতলায় নিজের ঘরে।

পুলকবাবুর ফিরতে রোজ দেরি হয়। এগারটা-সাড়ে এগারটার আগে কোনদিনই ফেরেন না। কোন কোনদিন বারটা-একটাও বেজে যায়। চাঁপা নিজের বিছানায় শুয়ে থাকলেও ঘুমুতে পারে না।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ছোটমা জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে চাঁপা, ঘুমিয়েছিস?

না।

পুলক বুঝি এখনও ফেরেনি?

না।

এতো রাত্তিরেও যে কোন ভদ্দরলোক বাড়ির বাইরে থাকে, তা কোন জন্মে দেখিনি।

তুমি কথা না বলে ঘুমোও।

হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছি, কিন্তু শান্তিতে কী ঘুমোতে পারি?

পুলকবাবু বাড়ি ফিরেই সোজা উপরে উঠে যান। পিছন পিছন চাঁপাও উপরে গিয়ে ওর ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, জামাইবাবু, খেতে দেব?

না, না; আমি খেয়ে এসেছি। তুই শুতে যা।

তবে যেদিন বাড়িতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করেন, সেদিন খেতে খেতে নানা কথা বলেন, বুঝলি চাঁপা, চাকরি-বাকরি ছেড়ে নিজের কারখানা করে লাখ লাখ টাকা আয় করছি ঠিকই কিন্তু বড্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এই তো আজ সারাদিন শুধু চা খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছি। সামান্য কিছু মুখে দেব, তারও সময় পাইনি।

চাঁপা বলে, সারাদিন এভাবে না খেয়ে থাকলে তো দু'দিনেই আপনার শরীর ভেঙে পড়বে। যেভাবেই হোক এক ফাঁকে বাড়ি এসে খেয়ে যাবেন।

কোন কোনদিন পুলকবাবু অন্য কথাবার্তাও বলেন।

হ্যাঁরে চাঁপা, তোর রাধাদি কেমন আছে?

ওর প্রশ্ন শুনে চাঁপা না হেসে পারে না। বলে, রাধাদির খবর আপনি জানেন না?

কী করে জানব বল? সে কী আমার সঙ্গে কথা বলে?

আপনিও তো রাধাদিব সঙ্গে কথা বলেন না।

পুলকবাবু একটু হেসে বলেন, আজকাল ও আমাকে সহ্য করতে পারে না।

তাই কখনো হয়?

সত্যি বলছি, ও আমাকে একদম বরদাস্ত করতে পারে না।

চাঁপা অবাক হয়ে বলে, কেন?

পুলকবাবু হাসতে হাসতেই বলেন, আমি যে খারাপ।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, বুঝলি চাঁপা, তোর রাধাদি যখন বিয়ের আগে আমার সঙ্গে স্ফূর্তি করতো, তখন আমি ভাল ছিলাম কিন্তু এখন আমি খারাপ হয়ে গেছি।

চাঁপা কী বলবে? অবাক হয়ে শুধু ওর কথা শোনে।

দ্যাখ চাঁপা, যে মেয়েকে নিয়ে বিয়ের আগে স্ফূর্তি করা যায়, তাকে বিয়ে করে সংসার করা যায় না।

এইভাবেই মাসের পর মাস কেটে যায়।

সেদিন সকালে পুলকবাবুকে একবার চা দিতে গিয়েই চাঁপা জিজ্ঞেস করল, জামাইবাবু, আমি যে চিঠিপত্র দিই, সেগুলো কী আপনিই ডাকবাক্সে দেন, নাকি. . . .

কেন বলতো?

কাটোয়া থেকে একটাও চিঠি এলো না বলে ভাবছি, মানিকদা কী আমার কোন চিঠিই পায়নি!

পুলকবাবু একটু হেসে বলেন, কারখানায় যাবার পথেই তো তোর চিঠি লেটার-বক্সে ফেলে দিই।

উনি একটু হেসে বলেন, তোর মানিকদা হয়তো বিয়ে-থা করে নতুন বউকে নিয়ে এমনই মেতে উঠেছে যে তোকে চিঠি লেখার সময়ই হয় না।

মানিকদা সে ধরনের মানুষই না। চিঠি পেলে উনি জবাব দেবেন না, তা হতেই

পারে না।

ওরে চাঁপা, এ সংসারে সবকিছু হতে পারে। কে যে কখন কিভাবে বদলে যাবে, তা কেউ বলতে পারে না।

চাঁপা গম্ভীর হয়ে বলে, জামাইবাবু, আপনি মানিকদাকে চেনেন না; তাই একথা বলছেন। মানিকদাকে কাটোয়ার ছেলেমেয়েরা কি শ্রদ্ধা করে, তা আপনি ভাবতে পারবেন না।

এইভাবেই দিন যায়। এই ক' মাসের মধ্যে ছোটমা'র শরীরের উন্নতি তো দূরের কথা, আরো অবনতি হয়েছে। আগে দেয়াল ধরে ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে পারতেন; এখন তাও পারেন না। প্রতিটি কাজের জন্য চাঁপার সাহায্য নিতে হয়। ডাঃ তেওয়ারীর ওষুধ খেয়ে এখন শুধু ঘুম পায়; আর কোন উপকার হয় না।

সেদিন পুলকবাবু সকালে বেরিয়ে হঠাৎ দুপুরে ফিরে এলেন।

চাঁপা জিজ্ঞেস করে, জামাইবাবু, আপনি কী খেয়েছেন?

নারে, খাওয়া হয়নি।

আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি খেতে দিচ্ছি।

পুলকবাবু খেতে বসে তরকারি দিয়ে ভাত মেখে এক গ্রাস মুখে দিয়েই এক গাল হাসি হেসে বললেন, অপূর্ব হয়েছে। আয়, এদিকে আয়।

চাঁপা একটু কাছে যেতেই উনি বাঁ হাত দিয়ে ওর গাল টিপে আদর করে বলেন, খেয়ে উঠেই তোকে প্রাইজ দেব।

পুলকবাবু খেয়েদেয়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে শোবার ঘরে যাবার পরই চাঁপাকে ডেকে পাঠান।

জামাইবাবু, আপনি ডাকছেন?

দরজার পাশে দাঁড়িয়েই চাঁপা জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁরে, তোর ছোটমা খেয়েছেন?

হ্যাঁ।

উনি কী বারান্দায় বসে আছেন?

না, না, উনি ঘুমুচ্ছেন।

এখন ঘুমুচ্ছেন?

ডাক্তারবাবুর নতুন ওষুধ খাবার পর থেকেই ছোটমা'র খুব ঘুম বেড়ে গেছে।

পুলকবাবু সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়েই একটু হেসে বলেন, কাছে আয়। তোকে প্রাইজ দেব তো।

চাঁপা কাছে যেতেই উনি এক হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে একটা একশ'

টাকার নোট সামনে ধরে বলেন, এই নে, তোর পুরস্কার।

না, না, আমি টাকা নেব না।

আমি যখন খুশি হয়ে দিচ্ছি, তখন নিবি না কেন?

আপনি আমার রান্না ভাল বলেছেন, সেই যথেষ্ট। এর জন্য টাকা নেব কেন?

পুলকবাবু ওকে আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে বলেন, আমি যখন খুশি হয়ে দিচ্ছি, তখন নিবি না কেন?

চাঁপা অস্বস্তিবোধ করলেও শুধু বলে, না, না, জামাইবাবু, আমি টাকা নেব না। টাকা নিয়ে আমি কী করবো?

না, চাঁপা কিছুতেই টাকা নেয় না।

কিন্তু এরপর থেকে দুপুরবেলা খেতে এসে বা মাঝরাত্তিরের পর বাড়ি ফিরে এলেই কারণে অকারণে চাঁপাকে কাছে টেনে নিয়ে একটু-আধটু আদর না করে ছাড়েন না পুলকবাবু। তাছাড়া কত প্রশংসা করেন!

সত্যি বলছি চাঁপা, তোকে দেখতেও যেমন সুন্দর, তোর রান্নাবান্না স্বভাব-চরিত্রও ঠিক তেমনি ভাল।

চাঁপা বলে, আমাকে যে কত সুন্দর দেখতে, তা কী আমি জানি না?

তুই বিশ্বাস কর, আমি শুধু তোর জন্যই দুপুরে বাড়ি আসি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আজকাল তোকে দেখতে, তোকে একটু কাছে পেতে এত ইচ্ছে করে যে কাজকর্মের ক্ষতি করেও বাড়ি চলে আসি।

আঃ! জামাইবাবু! কি যা তা কথা বলছেন?

পুলকবাবু হঠাৎ ওর বুকের উপর হাত দিয়েই বলেন, সত্যি বলছি চাঁপা, তোকে আমার বড্ড ভাল লাগে।

চাঁপা বিদ্যুৎগতিতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বেশ বিরক্ত হয়েই বলে, জামাইবাবু, আপনি এইসব আজেবাজে কথা বললে আমি আর আপনার ঘরে আসব না।

পুলকবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে চাঁপা অবাক হয়ে যায়। উনি যেভাবে আদর-টাদর করেন, যখন-তখন গায় হাত দেন, তা একটুও ভাল লাগে না। মনে মনে ভাবে, মানিকদা তো আমাকে অসম্ভব ভালবাসেন কিন্তু কই, তিনি তো কোনদিন জামাইবাবুর মত কাছে টেনে নিয়ে আদর করেননি। বড়মা মারা যাবার পর তো আমরা দু'জনেই অত বড় বাড়িতে থেকেছি। নির্জন দুপুরবেলা আর রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তো আমরা রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছি কিন্তু উনি তো কখনও আমার হাতের উপরও একটা হাত রাখেননি।

চাঁপা আরো কত কি ভাবে। বাথরুম থেকে শুধু শাড়িটা জড়িয়ে বেরিয়ে ঘরে

যাবার সময় উঠোনের মধ্যে হঠাৎ মানিকদার মুখোমুখি হয়েছি। আমার চাইতে উনি বেশি লজ্জা পেয়ে এদিক-ওদিক চলে গেছেন। আর ঐ অবস্থায় জামাইবাবু দেখলে বোধহয় আমাকে ছিঁড়ে খেতেন।

শুধু মানিকদা কেন? ওঁর বন্ধুরাও তো আমাকে কত ভালবাসেন। মানিকদা যখন বৈঠকখানা ঘরে ছেলেমেয়েদের পড়ান, তখন ওঁর কোন বন্ধু এলে তিনি তো বাড়ির মধ্যে আমার সঙ্গেই গল্পগুজব করেন কিন্তু ওঁরা তো কেউ কোনদিন জামাইবাবুর মত ব্যবহার করেননি।

তবে?

জামাইবাবু এসব অসভ্যতা করেন কেন? ওঁর নিজের কী কোন মান-সম্মানবোধ নেই?

এইভাবেই কয়েক মাস কেটে গেল।

বেশ কয়েক মাস পরে সেদিন রাত্তিরে পুলকবাবু আর রাধা একসঙ্গে খেতে বসেছেন। নানা বিষয়ে টুকটাক কথাবার্তা বলতে বলতেই পুলকবাবু বললেন, এখানকার দু'তিনজন ভাল ভাল ডাক্তারকে দেখিয়েও তো তোমার মা'র বিশেষ কিছু উন্নতি হল না।

রাধা বলল, উন্নতি তো দূরের কথা, মা'র অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে।

রাঁচী মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ আগরওয়াল বলেছিলেন, মা'কে ওখানে নিয়ে যেতে।

পুলকবাবু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার ফ্যাক্টরীর মিশ্র বলছিল, ডাঃ আগরওয়াল এই ধরনের অনেক রুগীকে ভাল করে দিয়েছেন।

মা'কে কী হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে?

আমার মনে হয় না, হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আমি ভেবেছি, মা'কে আমার অফিসের দোতলার একটা ঘরে রেখে ডাঃ আগরওয়ালকে দিয়ে চিকিৎসা করাবো।

মা ওখানে থাকলে অফিসের লোকজনদের কাজকর্মের কোন অসুবিধে হবে না?

ওদের আবার কী অসুবিধে হবে?

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, দোতলায় আমার ঘর ছাড়া অন্য তিনটে ঘর তো সারা বছরই ফাঁকা পড়ে থাকে। মাঝে-মধ্যে সেলস্-এর কেউ এলে এক-আধদিন থেকেই চলে যায়।

দু' একমিনিট চুপ করে থাকার পর রাধা বলে, মা ওখানে থাকলে তো আমার

পক্ষে মাসের মধ্যে দু'একবারের বেশি যাওয়া সম্ভব হবে না।

চাঁপা তো থাকবে। তোমার চিন্তার কী আছে?

আবার একটু চুপ করে থাকার পর রাধা জিজ্ঞেস করে, তোমার সেই পুরনো দারোয়ান আছে তো?

পুলকবাবু এক গাল হাসি হেসে বলেন, মথুরা আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে? ও মরার দিন পর্যন্ত আমার কাছেই থাকবে।

মা'কে নিয়ে কবে যেতে চাও?

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাঁচী গেলেও এবার যেতে পারব না। ঐ দিনই আমাকে দুর্গাপুর যেতে হবে। . . . .

ফিরবে কবে?

পরের দিনই ফিরব।

পুলকবাবু একটু থেমেই বলেন, ভাবছি শনিবার এখানকার কাজকর্ম সামলে রবিবারই তোমার মা'কে নিয়ে রাঁচী যাব।

ঠিক আছে, তাই যেও।

হ্যাঁ, পরের রবিবারই পুলকবাবু ওঁর শাশুড়ী আর চাঁপাকে নিয়ে রাঁচী চলে গেলেন।

নয়

রাঁচী শহরের কিছু দূরে পুলকবাবুর কারখানা। বোধহয় চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক ওখানে কাজ করে। তবে অফিস হচ্ছে শহরের মধ্যে বরিয়াতু রোডের উপর। পুরণো আমলের দোতলা বাড়ি। প্রত্যেক তলায় চারখানা করে বড় ঘর ছাড়াও সামনে-পিছনে বিশাল দুটো বারান্দা। সামনের দিকে প্রায় ফুটবল খেলার মাঠের মত খোলা জায়গা। পিছন দিকে আম-জাম-লিচু ইত্যাদি ফলের বাগান ছাড়াও ঝি-চাকর-দারোয়ানদের জন্য ছোট সাইজের দুটো কোয়ার্টার। পুরো চত্বরটা বেশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সব মিলিয়ে একটা ছোট-খাটো রাজবাড়ি।

মথুরা চাঁপাকে বলেছিল, কলকাতার যে চৌধুরী সাহেবরা এই বাড়ির আসল মালিক, তারা প্রায় রাজাদের মতই বড়লোক ছিলেন। দু' তিনটে বিলেতী মোটরগাড়ি চেপে এক একজন সাহেব ইয়ার-দোস্তদের নিয়ে এসে এখানে ক' দিন স্ফূর্তি করেই আবার কলকাতা ফিরে যেতেন।

ও একটু থেমে বলেছিল, বছর কুড়ি আগে একটা খারাপ মেয়ের হাতে ছোট সাহেব খুন হবার পর এই বাড়িতে আর কোনদিন আসেননি।

চাঁপা চুপ করে ওর কথা শোনে।

তারপর চৌধুরীরা এই বাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা করলেও কেউ কিনতে রাজি হল না।

কেন?

রাঁচী শহরের সবাই মনে করতো, এই বাড়িতে ভূত আছে।

ভূতের কথা শুনে চাঁপা চমকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, মথুরাদা, সত্যি এই বাড়িতে ভূত আছে?

আমি তো কোনদিন কিছু দেখিনি।

মথুরা একটু থেমে বলে, এই বাড়িতে আমাদের অফিস হবার আগে তিনদিন ধরে যজ্ঞ করা হয়েছিল। বোধহয় সেইজন্যই আমরা কেউ কোনদিন কিছু দেখিনি।

একতলার ডান দিকের কোণের ঘরখানা পুলকবাবুর অফিস। ওর পাশেই ম্যানেজার শর্মাজীর ঘর। অন্য দু'খানা ঘরে অন্য চোদ্দজন কর্মচারীরা বসেন। এদের মধ্যে তিনজন মেয়ে।

দোতলার রান্নাঘরের জানলা দিয়ে চাঁপা এদের আসা-যাওয়া আর দু' জন পিয়নকে সাইকেল নিয়ে হরদম এখানে-ওখানে যেতে দেখে।

পিছন দিকের কোয়ার্টারে মথুরা ওর স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। পুলকবাবু এখানে এলে ওর ড্রাইভার ওদের পাশের ঘরে থাকে।

ছোট মা'কে দেখাশুনা আর রান্নাবান্নার ফাঁকে সময় পেলেই চাঁপা পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আম-জাম-লিচু গাছের মধ্যে দিয়ে চাঁপা চলে যায় মথুরার স্ত্রীর কাছে। গল্প করে, আচার খায়।

মধ্য বয়সী মথুরা আর ওর স্ত্রীকে চাঁপার খুব ভাল লাগে। সংসারের কাজকর্ম শেষ হলেই মথুরার স্ত্রীও দোতলায় এসে চাঁপার সঙ্গে গল্প করে বা দরকার মত ছোট মা'কে দেখাশুনা করে।

পুলকবাবু এখানে না থাকলে অফিস ছুটির পর চাঁপা কখনও কখনও মথুরার সঙ্গে একতলার অফিস ঘরগুলো ঘুরে-ফিরে দেখে।

চাঁপা বলে, আচ্ছা মথুরাদা, জামাইবাবু বেশ বড় ব্যবসাদার, তাই না?

হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানী বেশ ভালই চলে।

মুহূর্তের জন্য থেমে মথুরা বলে, সাহেব সব কর্মচারীদের খুব ভাল মাইনে বোনাস-টোনাস দেন বলে কর্মচারীরাও জান লড়িয়ে কাজ করে।

ও আবার একটু থেমে একটু হেসে বলে, সারাদিন আমাদের সাহেব বড় ভাল মানুষ কিন্তু রাত্তির বেলায় শরাব পেটে পড়ার পর উনি কি যে করবেন, কেউ জানে না।

হ্যাঁ, মথুরাদা, ঠিকই বলেছ।

চাঁপা একটু থেমে বলে, জামসেদপুরেও দেখতাম, উনি মদ খেলেই বড্ড বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা শুরু করে দেন।

চাঁপার কাছে ওর দীর্ঘ কাহিনী শুনতে শুনতে যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। জিজ্ঞেস করি, ছোট মা কী এখনও রাঁচীতেই আছেন?

মাত্র মাস তিনেক আগেই ছোট মা মারা গেলেন।

ও!

এক মুহূর্ত থেমেই জিজ্ঞেস করি, ছোট মা মারা যাবার পর পরই তুই চলে এলি না কেন?

আসতে দিলে তো আসব।

চাঁপা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, আমি হাজার বার ওকে বলেছি, আমাকে কাটোয়ায় পাঠিয়ে দিন, কিন্তু সব সময়ই উনি বলেছেন, এই কয়েক দিনের মধ্যেই তোকে পাঠিয়ে দেব।

তারপর?

রাঁচীতে যাবার পরই জামাইবাবু বড্ড বেশি অসভ্যতা করতে শুরু করলেন। অফিসের লোকজন চলে যাবার পর উনি যখন-তখন আমাকে ওর অফিস ঘরে ডেকে পাঠাতেন।

কেন?

উনি এটা-ওটা দেবার কথা বললেও আসলে আমার গায় একটু-আধটু হাত দেবার মতলবেই বার বার ডেকে পাঠাতেন।

তুই বারণ করতি না কেন?

হাজার বার বারণ করলেও কি উনি শুনতেন?

চাঁপা একটু থেমে বলে, একদিন একটু বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করতেই আমি ওর একটা হাত কামড়ে দিয়েছিলাম।

শুনেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করি, তারপরও ঐ ছোটলোকটা তোকে বিরক্ত করতো?

রাঁচীতে থাকলেই উনি আমাকে বিরক্ত করতেন।

মথুরা কিছু করতে পারতো না?

মথুরা খেয়েদেয়ে ওর কোয়ার্টারে শুয়ে পড়ার পরই তো জামাইবাবুর অসভ্যতা বেড়ে যেত।

শ্রীপর্ণা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, জানো দাদা, ঐ দৈত্যটার ভয়ে চাঁপা সারারাত জেগে থাকতো। মেয়েটা কত রাত্তির যে ভাল করে ঘুমোয় নি, তা শুনে তো আমারই মাথা ঘুরে গেছে। তাছাড়া চেহারার কি ছিরি হয়েছে, তা দেখেছ?

শুনে আমি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

এবার শ্রীপর্ণা চাঁপার দিকে তাকিয়ে বলে, এবার তুই আসল ঘটনাটা বল।

চাঁপা মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই মুখ নীচু করে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাগে দুঃখে লজ্জায় ওর দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের জন্য একবার যেন কেঁপে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে খুব চাপা গলায় বলে, সে রাত্রে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত জেগেই ছিলাম কিন্তু তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা বুঝতেও পারিনি। হঠাৎ কে যেন আমার কাপড় খুলে নেবার চেষ্টা করতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।. . . .

তুই কি বলছিস চাঁপা?

চাঁপা কাঁদতে কাঁদতেই বলে, আমি আমার মরা বাবা-মায়ের নামে দিব্যি করে বলছি, আমি এক বর্ণ মিথ্যে বলছি না।

ও একবার থেমে একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, ঘুম ভাঙতেই দেখি, জামাইবাবু আলো জ্বালিয়ে আমার শাড়ি ধরে টানতে টানতে বলছেন, আজ তোকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছি না।

এ রাম! রাম!

আমি চিৎকার করে উঠতেই উনি ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মেরেই যা তা বলতে শুরু করলেন।

তারপর?

আমি কি অসুরটার সঙ্গে পেরে উঠি! উনি আমার শাড়িটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েই আমার ব্লাউজটা ধরতেই আমার মাথায় খুন চড়ে গেল।

চাঁপা না থেমেই বলে যায়, ধ্বস্তাধ্বস্তি মারামারির মধ্যেই আমি টেবিলের উপর থেকে ছোট মা'র ফল কাটার ছুরিটা তুলে নিয়ে ওর বুকে বসাতে গেলাম।

ও প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে, ঐ টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে ছুরিটা বুকে না বসে হাতে লাগতেই উনি চিৎকার করে পড়ে গেলেন।

ঠিক করেছিস।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে আমি এক দৌড়ে মথুরাদার ঘরে হাজির।

শ্রীপর্ণা বলল, জানেন দাদা, ওরা স্বামী-স্ত্রী চাঁপাকে পুরো একটা দিন ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে পরের দিন রাত্রে কলকাতার ট্রেনে চড়িয়ে দেয়।

চাঁপা ঝপ করে বসে পড়েই আমার দুটো পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মানিকদা, তুমি আমাকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে তোমার কাছেই রেখে দাও। আমি আর কিচ্ছু না। আমি যেমন ছিলাম, তেমনি থাকবো। তোমাকে কোনদিন বিরক্ত করবো না।

ও কোনমতে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই।

আমি দু' হাত দিয়ে ওকে তুলে ধরে বললাম, হ্যাঁ, আমি তোকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়েই আমার কাছে রেখে দেব।

শ্রীপর্ণা এক গাল হাসি হেসে সুধীরের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে, এই হচ্ছে আমার দাদা!

সুধীর হাসতে হাসতে চাঁপাকে বলল, এবার থেকে তোকে আমি রুদ্রাণী বলে ডাকব।